আওয়ামী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিবেকের আওয়াজ

ইতিহাস পরিষদ

আওয়ামী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিবেকের আওয়াজ

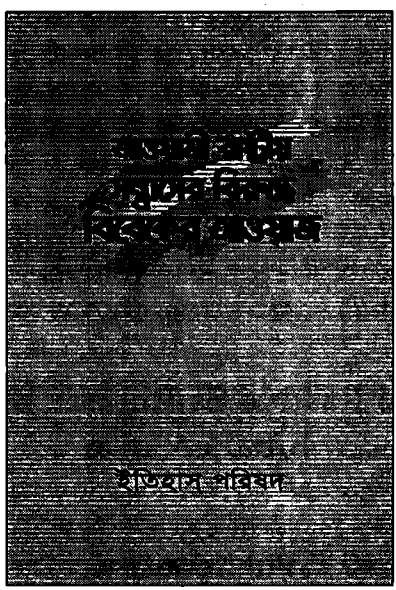

ইতিহাস পরিষদ

www.pathagar.com

আওয়ামী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বিবেকের আওয়াজ

প্রকাশনায়
ইতিহাস পরিষদ
সাভার, ঢাকা

প্রকাশকাল
আগস্ট, ২০০০

মুদ্রণে
জনকল্যাণ প্রেস, ঢাকা

মূল্য : ১৫.০০ টাকা মাত্র

Awami Rastiyo Santhraser Birudde Bibaker Awaj

Published by
Etihas Parishad
Savar, Dhaka

Printed by
Janakallayan Press, Dhaka

Price. Tk. 15.00 only

www.pathagar.com

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
●	ভূমিকা	৪
১.	আওয়ামী ছাত্রলীগের দলীয় কোন্দল ও খুনাখুনি	৮
২.	ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের : ১২ জুলাই চট্টগ্রামে আট খুনের ঘটনা	১১
৩.	উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে : জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর দোষ চাপানোর ষড়যন্ত্র	১৭
৪.	জামায়াতে ইসলামীর তীব্র প্রতিবাদ	২৫
৫.	রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য-বিবৃতি	৩৩
৬.	বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, শিক্ষক ও উলামা মাশায়েখদের বিবৃতি	৩৭
৭.	আওয়ামী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন-১ পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট	৪২
৮.	আওয়ামী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন-২ পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয়	৬০
৯.	আওয়ামী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন-৩ পত্র-পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয়	৬৯
১০.	আওয়ামী ষড়যন্ত্রের আসল লক্ষ্য ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান	৯৩
●	শেষ কথা	১১২

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক নৈরাজ্যকর ও উদ্দেশ্যহীনতার দিকে দ্রুত ধাবমান। কেউ বলতে পারছেনা অদূর ভবিষ্যতে কি ঘটতে যাচ্ছে। চতুর্দিকে হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণের তাণ্ডবের মধ্যে বর্তমান সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের আন্দোলন দমনের জন্য বেপরোয়া গ্রেফতার এবং পুলিশী দমননীতির আশ্রয় নিয়েছে। চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটের হত্যাকান্ডের ঘটনা সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরই পরিণাম জেনেও সরকার এর জন্য জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের ওপর দোষ চাপিয়ে দেওয়ার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়ে ব্যাপকভাবে জামায়াত নেতাদের এবং শিবিরের নিরপরাধ ছেলেদের জেলে পুরেছে। অন্যদিকে কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার নিয়তে বোমা পেতে রাখার জন্যও সরকার প্রথমে জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করতে চায়। পরে এর সাথে সরকারী ছাত্র সংগঠনটির কিছু সদস্যের সংশ্লিষ্টতার খবর প্রকাশিত হলে বিষয়টি একটু অন্যদিকে মোড় নেয়। এখন বলা হচ্ছে হরকাতুল জেহাদ নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সদস্য মুফতি আবদুল হান্নানই এই ঘটনার পেছনে আছে। লোকটি ভারতে পালিয়ে গেছে বলে সংবাদপত্রে সংবাদ রটেছে। অন্যদিকে যশোরের প্রখ্যাত সাংবাদিক শামছুর রহমানকে তার অফিসে কর্মরত অবস্থায় গুলী করে হত্যা করা হলে সারা দেশে তীব্র গুঞ্জন ও প্রতিবাদধ্বনি উত্থিত হয়। এই হত্যাকাণ্ডের জন্যও মৌলবাদীদের ওপর দোষারোপের চেষ্টার সাথে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী তুলে ক্ষমতাবানদের ভেতরকার কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা ও মন্ত্রী বক্তৃতা বিবৃতি দিতে থাকেন। আওয়ামী বুদ্ধিজীবী শ্রেণী, শিল্পী, সাহিত্যিক, নাট্যকর্মী ও সংস্কৃতিসেবীরা রমনায় মহাসম্মেলন ডেকে সাম্প্রদায়িক বিরোধী বক্তব্যের সাথে জামায়াত-শিবির তথা ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জিগির তুলে। এর মধ্যে সারা বাংলাদেশ ব্যাপীই শুরু হয়ে যায় ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনটির জামায়াত-শিবির অফিস ও বাড়িঘরে হামলা। স্বয়ং দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'যেখানেই জামাত সেখানেই প্রতিরোধ', একটি লাশের পরিবর্তে দশটি লাশ জামায়াত-শিবিরকে প্রতিরোধ করুন পুলিশ আপনাদের সহযোগিতা করবে, নকশালীদের যেভাবে দমন করা হয়েছে সে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সরকার জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণার চিন্তাভাবনা করছে। এই ধরনের উগ্র বেআইনী ও উসকানীমূলক বক্তব্য প্রদান করায় দেশে এক অনাকাঙ্খিত উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। বিভিন্নস্থানে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের কর্মীরা প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে উৎসাহিত হয়ে জামায়াত-শিবিরের কার্যালয় এমনকি বাড়িঘরে পর্যন্ত সশস্ত্র হামলা চালায়। অনেকস্থানে সশস্ত্র মিছিল সহযোগে 'হৈ হৈ রৈ রৈ জামায়াত-শিবির গেল কৈ, একটা দুইটা শিবির ধর

www.pathagar.com

সকাল বিকাল নাস্তা কর, শিবির ধর জবাই কর', ইত্যাদি শ্লোগান দিয়ে এক চরম নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। আওয়ামী সন্ত্রাসীদের হামলায় এযাবত দেশের বিভিন্ন স্থানে জামায়াতে ইসলামীর প্রায় ৪০টি অফিসে ভাংচুর, ক্ষতিসাধন এবং কোথাও কোথাও অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটে এবং বেশ কিছু জায়গায় জামায়াতের পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইয়াতীমখানায় হামলা চালায়। প্রশাসন ও পুলিশ হামলাকারীদের নিরস্ত্র না করে উল্টো জামায়াতের নেতা কর্মীদের গ্রেফতার করে। এ যাবত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী চট্টগ্রামে মাহমুদুর রহমান নামে একজন জামায়াত কর্মী এবং দিনাজপুরে আবু বক্কর সিদ্দীক নামে একজন জামায়াত নেতা সন্ত্রাসীদের হাতে শহীদ হন। প্রায় শতাধিক আহতদের মধ্যে বেশ ক'জন এখনও আশঙ্কামুক্ত নয়। মেহেরপুরে জামায়াতের আমীর মাওলানা ছমির উদ্দিন ও চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের সেক্রেটারী মাওলানা শামসুল ইসলামসহ দুই শতাধিক জামায়াত নেতা ও কর্মীদের পুলিশ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে। এদের মধ্যে প্রায় ১১৫ জনের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা দায়ের করা হয়। উল্লেখ্য যে জামায়াতে ইসলামীর প্রবীন নেতা কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টারীয়ান মাওলানা আবদুস সোবহান সাহেব, বরিশাল শহর জামায়াতের আমীর এডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসাইন হেলালের বাসভবন এবং তাঁর চাচার বাসভবনে পর্যন্ত হামলা চালিয়ে বিপুল ক্ষতিসাধন করা হয়। এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র-শিবির চরম ধৈর্য্যের পরিচয় দান করেছে।

বর্তমান শাসনামলে ছাত্রসংগঠনগুলোর পারস্পরিক সংঘর্ষ ও হত্যা ইত্যাদি কোনো নতুন ঘটনা নয়। কেবল যে রাজনৈতিক আদর্শগত বিরোধের জন্যই ছাত্রহত্যা ঘটে এমন নয়। হল দখল, বিভিন্ন এলাকায় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাব বিস্তার এবং চাঁদাবাজি, ছিনতাই এবং জবরদস্তিমূলক অর্থ আদায়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যও এসব ঘটে চলেছে। এর জন্য অতীতেও বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করার দাবী ওঠেনি।

অতীতে রাশেদ খান মেননের হত্যা প্রচেষ্টার জন্য, যশোরের উদীচীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণে কয়েকজনের নিহত হওয়ার ঘটনায় এবং কুষ্টিয়ার জাসদ নেতা কাজী আরিফের নির্মম হত্যাকাণ্ডের সাথেও জামায়াত-শিবিরকে জড়িত করার চেষ্টা করেছিল। পরে এসব নিয়ে যৎসামান্য তদন্তেই অন্য তথ্য বেরিয়ে পড়লে জামায়াত-শিবির এইসব অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পেলেও যারা বাংলাদেশ থেকে ইসলামের উচ্ছেদ কামনায় দিনরাত কাজ করে চলেছে তাদের আক্রোশ কমেনি।

কেবল ক্ষমতাসীনরাই জামায়াত-শিবির তথা বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনকে নিভিয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এমন নয় এর সাথে সরকার সমর্থক কয়েকটি দৈনিক পত্রিকাও একযোগে কাজ করছে। তারা কোনো একটি অজুহাত বা অছিলা পেলেই এমনভাবে জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে সংবাদ পরিবেশন করে ও তৎপর হয়ে ওঠে যা সংবাদপত্রের কোনো স্বীকৃত নীতিমালাই সমর্থন করেনা। তাদের সংবাদ প্রকাশের

www.pathagar.com

সূত্রগুলো এতটাই আন্দাজনির্ভর ও গুজবপ্রিয় যে অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করেই এবং তথ্যানুসন্ধানের সামান্যতম কোনো চেষ্টা না করেই প্রথম পৃষ্ঠায় জামায়াত-শিবিরকে দোষী সাব্যস্ত করে খুন, জখম, বোমা পেতে রাখার মত জঘন্য ঘটনার খবর পরিবেশন করে।

একটি রাজনৈতিক দল যারা প্রকাশ্যেই দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাথে দীর্ঘকাল ধরে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক, যাদের কোনো অবস্থাতেই কোন সশস্ত্র বিপ্লবের কর্মসূচী নেই, তাদের বিরুদ্ধে কয়েকটি সংবাদপত্রের এই ধরনের মিথ্যা ও বানানো সংবাদ নিত্য পরিবেশনের ঘটনা বিশ্বের আর কোথাও এমন বাধাহীনভাবে চলতে বড় একটা দেখা যায় না। তবুও বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, জনগণের অন্তরে এবং বিরোধী দলীয় ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক কর্মসূচীতে শরিক থেকে তাদের বিপুল সংগঠনিক শক্তির পরিচয় দিতে পারছে এর প্রধানতম কারণ হল এদেশের মাটিতে ইসলামের প্রচার প্রসার এবং ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুদৃঢ় সংকল্প এবং আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর প্রতি সুগভীর বিশ্বাস। ঈমান ও শৃংখলার জোরেই জামায়াত-শিবিরের প্রতি বর্তমান ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক চাপের মুখেও অযাচিত ক্ষেত্রসমূহ ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্য থেকে সমর্থনের শব্দ বেরুতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক কারণে জামায়াত-শিবিরকে সমর্থন দিতে এদের অতীতে আমরা বড় একটা দেখিনি, সাম্প্রতিককালে জামায়াতের ওপর সরকারী দোষারোপ, ক্ষমতাসীনদের হিংস্র হামলা এবং জামায়াত-শিবিরের ওপর পুলিশী অভিযানের তারাও প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করছেন না।

জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের ওপর এই ধরনের রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি কোনো নতুন ঘটনা নয়। স্বাধীনতার পর থেকেই পরিকল্পিতভাবে এই রাজনৈতিক সহিংসতা শুরু। আওয়ামী বাকশালীরাই মূলত এই সন্ত্রাস ও সহিংসতার লালনকারী। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব এবং গণতান্ত্রিক বিধিবিধান মান্য করার স্বার্থে জামায়াতে ইসলামী অতীতেও একটিবারের জন্যও এর পাল্টা কোনো ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেনি। এখনও করেনা।

তবে তারা একথাও ভাবে না যে বর্তমান ক্ষমতাসীনরা ও তাদের ভারতপন্থী বুদ্ধিজীবী গ্রুপ, দালাল ও তাবেদারদের একপেশে হুমকি ও সন্ত্রাসের মাধ্যমেই ইসলামী আন্দোলনকে আত্মমর্যাদাহীন অবস্থায় ঠেলে নিয়ে যাবে। কোনো দেশের ইসলামী আন্দোলনই এই অপমান সহ্য করেনি। জামায়াত-শিবিরও এই হীনতা মেনে নিতে পারবেনা। আমরা আশা করি দেশের জনগণ গনতন্ত্র ও ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন সমূহ ইসলাম ও গণতন্ত্র বিরোধী সমস্ত তৎপরতার সমুচিত জবাব দিয়ে এবং অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত রাজনৈতিক প্রতিরোধ গড়ে তুলবে।

www.pathagar.com

অত্যন্ত অনুতাপের বিষয় এদেশের প্রাত্যহিক রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের বিশেষ করে সংবিধান সম্মত হয় তেমন কোনো রাজনৈতিক নিপীড়নের খতিয়ান নিপীড়িত ও জুলুমের শিকার রাজনৈতিক দলগুলো ছাপার অক্ষরে ধরে রাখেনা। কিছুকাল অতিবাহিত হলেই যে সমস্ত কার্যকলাপ ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত হবে তেমন উপাদান শেষ পর্যন্ত আর খুঁজে পাওয়া যায় না। যেসব কার্যকলাপের ফলে কিংবা রাজনৈতিক হত্যা নিপীড়নের মাধ্যমে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে তারা অবস্থার পরিবর্তনের পরও এর পেছনে প্রতিকার বা বিচার পায় না।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের ওপর বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন দল ও তাদের অংগসংগঠনসমূহ যে ধরনের উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা, প্রমাণহীন মিথ্যা দোষারোপ এবং গ্রেফতার তান্ডব শুরু করেছে তা এক কথায় ভয়াবহ এবং দমনমূলক। এর সাথে সহযোগিতা করে চলেছে কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা। প্রকৃতপক্ষে তারা জামায়াত-শিবিরের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা নিষিদ্ধ করার পক্ষে প্রকাশ্যে প্রচারণা চালাচ্ছে। যদিও একাজ, আমরা মনে করি যে কোনো নির্বাচিত সরকারের পক্ষেই অসম্ভব। তবুও সরকারের সাম্প্রতিক আচরণের হিংস্রতার তথ্যসমূহ, কিছু সংবাদপত্রের হলুদ সাংবাদিকতার যৎসামান্য দৃষ্টান্ত, আমরা ভবিষ্যতের জন্য ধরে রাখার উপায় হিসেবে এই পুস্তিকা প্রকাশের আয়োজন করেছি। এতে ভবিষ্যতে ইতিহাস লেখার ও বিশেষজ্ঞগণ ইসলামী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর সর্বোপরি বাংলাদেশের মাটি থেকে ইসলাম ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার এক বহুধা বিস্তৃত দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্রের সূত্রগুলো খুঁজে পাবেন।

হিংস্রতাই হিংস্রতার জন্ম দেয়। আমরা ঠিক বুঝতে পারছি না বাংলাদেশের ভবিষ্যত কি? তবে এটা জোর দিয়েই বলতে পারি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য এদেশের মুজাহিদরা সুদূর অতীতে যেমন অকাতরে শাহাদাতের পেয়ালা পান করেছেন। বর্তমানেও এই ঐতিহ্য এতটুকু ক্ষুণ্ন হয়নি। সম্প্রতি সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক সংগ্রামের পথে ইসলামী আন্দোলনের রাজনৈতিক পক্ষগুলো যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে শত নিপীড়ন ও বাধার মধ্যেও সেই অঙ্গীকার আল্লাহ পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাবেন। ইসলাম ছাড়া বাংলাদেশের অস্তিত্ব যে কষ্টকল্পনা মাত্র বার বার ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী সরকারগুলো তা প্রমাণ করেছে। অত্যাচারী স্বৈরাচারী ও তাবেদারীই তাদের নিয়তি। সেদিন আর বেশি দূরে নয় যেদিন দেশের জনগণ স্বতস্ফূর্তভাবেই ইসলামের পক্ষে অবস্থান নিবেন এবং বাংলাদেশ হবে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার এক কল্যাণমূলক ইসলামী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। আল্লাহ বারো কোটি মানুষের আশা আকাংখা ও আত্মত্যাগের প্রতিদান নিশ্চয় দেবেন।

www.pathagar.com

আওয়ামী ছাত্রলীগের দলীয় কোন্দল ও খুনাখুনি

আওয়ামী লীগের বিশেষ করে তার অংগসংগঠন ছাত্রলীগের দলীয় কোন্দল এবং এর পরিণতিতে খুনাখুনি অহরহ লেগেই থাকে। আর আওয়ামী লীগ যখনই ক্ষমতায় আসে, তখনই তাদের দলের বিশেষ করে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর খুনাখুনি মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যায়। বিভিন্ন গ্রুপের প্রভাব বিস্তার, অবৈধ দখল, চাঁদাবাজি, লুটপাটের অর্থ ভাগাভাগি থেকেই ঘটে খুনাখুনি। ১৯৯৬ সালে পুণরায় ক্ষমতায় আসার পর বিগত চার বছরে তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, গ্রুপিং খুনাখুনি অহরহই ঘটছে।

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর খুনাখুনি আওয়ামী লীগের অস্তিত্বের মতোই সত্য, বাস্তব এবং যা প্রতিটি মানুষের জানা। দেখুন পত্রিকার রিপোর্ট ঃ

মহানগর পাঁচ ক্যাডার গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে
ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে চট্টগ্রামে ৮০ জন খুন

চট্টগ্রাম ব্যুরো

কলেজসহ এলাকার নিয়ন্ত্রণ চাঁদাবাজি ও টেন্ডারবাজি নিয়ে চট্টগ্রামে শাসকদলীয় ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের অন্তর্কোন্দলে এ পর্যন্ত প্রায় ৮০ জন নেতা-কর্মী-ক্যাডার খুন হয়েছে। এর মধ্যে নগরীতে খুন হয়েছে ৩০ জন এবং উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে প্রাণ হারিয়েছে ৫০ জন। নগরীর ছাত্রলীগ আজম নাসির গ্রুপ, মামুন গ্রুপ, কাদের গ্রুপ, ছেঁড়া আকবর গ্রুপ, তাহের গ্রুপ নিয়ন্ত্রণ করছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি আবাসিক হলসহ চট্টগ্রামের ৬টি কলেজ। উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি নিয়ন্ত্রণ করছে ছাত্রলীগের তৈয়ব ও টিপু গ্রুপ।

এলাকার নিয়ন্ত্রণ, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজিসহ চোরাচালানীর নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য ছাত্রলীগের বিবদমান গ্রুপগুলো একে অন্যের ওপর চড়াও হয়েছে। কমার্স কলেজভিত্তিক ছাত্রলীগ কাদের গ্রুপ আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকাসহ মোগলটুলী-মাদারবাড়ী এলাকায় মাসে কোটি টাকার ওপরে চাঁদাবাজি করে থাকে। এসব এলাকা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রায় ছাত্রলীগ কাদের গ্রুপ ও নাসির গ্রুপের মধ্যে রক্তক্ষয়ী বন্দুকযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

ছাত্রলীগ মামুন গ্রুপ এমইএস কলেজভিত্তিক। এরা ওআর নিজাম এলাকা, খুলশী এলাকা ও ষোলশহর এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। খুলশী আবাসিক এলাকায় পাহাড়ী জায়গা-জমি দখলের বিনিময়ে চাঁদা আদায়সহ বিভিন্ন সরকারি অফিসে টেন্ডারবাজি করে থাকে। চট্টগ্রাম পলিটেকনিক কলেজ ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট বারবার হাত বদল হয়ে ছাত্রলীগ ছেঁড়া আকবর ও তাহের গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে থাকছে। বায়েজিদ বোস্তামীর শিল্প এলাকাসহ পাহাড়ী জমি দখল নিয়ে এরা প্রায় বন্দুকযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

www.pathagar.com

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের সবচেয়ে শক্তিশালী গ্রুপটি হলো আজম নাজির গ্রুপ। এরা চট্টগ্রামের আইন কলেজ, মেডিক্যাল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও তাহের গ্রুপের মাধ্যমে পলিটেকনিক কলেজ ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ছাত্রলীগের এই গ্রুপের নেতা আজম নাসির আগামীতে নগরীর মেয়র মহিউদ্দিনের একক কর্তৃত্ব খর্ব করার যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে উঠে আসছে। নগরীতে এই গ্রুপের সাথে ছাত্রলীগ বিবদমান গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ বেশি হচ্ছে। মূলত টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ব্রীজের টোল আদায় এদের আয়ের উৎস।

সিটি কলেজভিত্তিক মসিউর রহমান গ্রুপ নিউ মার্কেট ফিরিঙ্গিবাজার, পাথরঘাটা নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। বাকশাল থেকে আসা ছাত্রলীগের এই গ্রুপটি পার্শ্ববর্তী ইসলামিয়া কলেজও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

অন্যদিকে নগরীর বাইরে উত্তর চট্টগ্রামের কিলিং জোন হিসেবে ফটিকছড়িতে ছাত্রলীল টিপু ও তৈয়ব গ্রুপ সবচেয়ে আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে প্রায় নিজেদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে লিপ্ত হয়। এই গ্রুপ ফটিকছড়িকে দুভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। স্থানীয় এমপির সমর্থনপুষ্ট তৈয়ব গ্রুপ এলাকার বেশির ভাগ সরকারী টেন্ডার, চোরাই কাঠ, অপহরণের মাধ্যমে চাঁদা আদায়সহ গভীর অরণ্যে চোরাচালানের সাথে জড়িত। বর্তমানে এই দুই গ্রুপের সংঘর্ষের ফলাফল দুই/তিনটি লাশের মাধ্যমে শেষ হয়।

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের অন্তর্কলহ কাটেনি

কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের নির্দেশ সত্ত্বেও চট্টগ্রাম মহানগরী ছাত্রলীগের বহুধা বিভক্ত গ্রুপ কর্মীসহ ৮ জনের হত্যাকান্ডের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক অজয়কর খোকন গত রোববার চট্টগ্রামে লাঠি মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করেছিল। লালদীঘি ময়দানে এ সমাবেশের ঘোষণা দেয়া হলেও মহানগর ছাত্রলীগের তিনটি গ্রুপ পৃথক পৃথকভাবে গত রোববার সমাবেশ ও লাঠি মিছিল করে। আজম নাসির সমর্থিত গ্রুপ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা সমাবেশ করে আন্দরকিল্লা চত্বরে।

দৈনিক দিনকাল- ১৮/৭/২০০০

১৯৯৯-২০০০ সালে আওয়ামী ছাত্র লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহতের সংখ্যা

১. '৯৯ সালের ২৬শে মার্চ সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে ১জন নিহত হয়।
২. গত '৯৯ সালের ২৭শে মার্চ সিরাজগঞ্জে একজন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হয়েছে।
৩. '৯৯ সালের ৮ই মে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের গোলাগুলিতে ১জন নিহত হয়েছে।
৪. গত '৯৯ সালের ২০শে মে বগুড়ায় অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ছাত্রলীগের ২জন নিহত হয়েছে।

www.pathagar.com

৫. '৯৯ সালের ১১ই জুলাই তেজগাঁও পলিটেকনিক কলেজে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে সোহেল নিহত হয়। এর কিছু দির আগে একই কলেজে ছাত্রলীগের আহ্বায়ক মনির হোসেন খুন হয়েছে।
৬. ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে তেজগাঁও পলিটেকনিক কলেজে ৩০শে মার্চ ২০০০ দিবাগত রাতে ছাত্রলীগ নেতা হাবিবুর রহমান জাহিদ নিহত হয়েছে।
৭. গত ৯ই মে ২০০০ ফেনীতে অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ছাত্রলীগ কর্মী আবু তালেব নিহত হয়।
৮. গত ৬ই জুলাই ২০০০ শরিয়তপুরে ছাত্রলীগের একজন কর্মী অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হয়েছে।
৯. গত ১১ই জুলাই ২০০০ চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে তিনজন নিহত, আহত ১২।

ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ১১ জুলাই ফটিকছড়িতে ৩ জন নিহত

১২ জুলাইর আগের দিন ১১ই জুলাই ২০০০ ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত হয় ৩ জন, আহত হয় ১২ জন। সংবাদ সংস্থা ইউ.এন.বি-র খবর দেখুন।

ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপ ফের মুখোমুখি বন্দুক যুদ্ধে নিহত ৩, আহত ১২

ইউএনবি ঃ চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির কাঞ্চন নগরে গতকাল মঙ্গলবার ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধে সংগঠনের তিনজন কর্মী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১৫ জন। সশস্ত্র লড়াই শেষ হবার পর বিকাল ৪টায় পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সেখানে পুলিশ খোরশেদ আলম ও মোহাম্মদ ইলিয়াস নামে দুই ছাত্রলীগ কর্মীর লাশ পড়ে থাকতে দেখে। দু'জনই গুলিতে মারা যায়। মোহাম্মদ মাসুদ নামের অপর এক ছাত্রলীগ কর্মীর লাশ তার সঙ্গীরা পাশের গভীর জঙ্গলে নিয়ে যায়। পুলিশ মাসুদের মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছে এবং নিহতের সংখ্যা আরো বাড়বে বলে আশংকা প্রকাশ করেছে।

বিবাদমান দুটি গ্রুপের একটির নেতৃত্ব দিচ্ছে টিপু ও অপরটির তায়েব। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এলাকায় প্রাধান্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে গত চার বছর ধরে এই দুটি গ্রুপ প্রায়ই সশস্ত্র সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

গুলিবিদ্ধ আহত ১৫ জনের মধ্যে ৭ জনকে চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বাকি ৮ জনকে স্থানীয় ক্লিনিকে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। আহতদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

দৈনিক দিনকাল ১২/৭/২০০০

www.pathagar.com

ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ঃ
১২ জুলাই চট্টগ্রামে আট খুনের ঘটনা

১১ জুলাইর পরদিন ১২ জুলাই ২০০০ চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে ছাত্রলীগের ৬ জনসহ ৮ জন নিহত হয় ছাত্রলীগেরই প্রতিদ্বন্দ্বিদের গুলিতে। পরদিন পত্রপত্রিকায় এ খবর প্রকাশিত হয় ঃ

চট্টগ্রামে ব্রাশ ফায়ারে ছাত্রলীগের ৬ ক্যাডারসহ ৮ জন নিহত

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ বন্দরনগরী চট্টগ্রামে সশস্ত্র ক্যাডারদের পদচারণা আবার শুরু হয়েছে। অস্ত্রধারীরা গতকাল (বুধবার) প্রকাশ্যে রাজপথে ব্রাশ ফায়ার করে ৬ জন ছাত্রলীগ ক্যাডারসহ ৮ জনকে হত্যা করেছে। সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে আরো ৫ জন আহত হয়েছে। চট্টগ্রামের ইতিহাসে নজিরবিহীন লোমহর্ষক এ হত্যাকাণ্ডটি সংঘটিত হয়েছে নগরীর ব্যস্ততম বহদ্দারহাটে। খাজা রোড়ের মাথায় বেলা সোয়া ১১টায় এ হত্যাকান্ডের জন্য ছাত্রলীগ তাৎক্ষণিকভাবে জামায়াত শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডারদের দায়ী করেছে। ২৪ ঘন্টার মধ্যে খুনীদের গ্রেফতার করার দাবী জানিয়েছে। পুলিশ ঘটনার পর চট্টগ্রাম কলেজ, মহসিন কলেজসহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে শিবির নেতা-কর্মীসহ ১৭ জনকে গ্রেফতার করেছে। এ নিয়ে মাত্র ২২ ঘন্টার মাথায় রাজনৈতিক সহিংসতায় চট্টগ্রামে ১১ জন খুন হয়েছে। রাত ৮টায় প্রাপ্ত খবরে জানা যায়, চট্টগ্রাম হত্যাকান্ডের প্রেক্ষিতে পুলিশের আইজি বন্দরনগরীতে এসে পৌছান। ইনকিলাব- ১৩/৭/২০০০

এইট মার্ডারের পর ছাত্রলীগের কোন্দল মিটানোর চেষ্টা
চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীন কোন্দল ভয়াবহ রূপ ধারণ ঃ
মন্ত্রীর উপস্থিতিতে নেতাদের হাতাহাতি

আহমেদ করিম ঃ চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দল ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। শেখ হাসিনার নির্দেশে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের বিবদমান তিন গ্রুপের মধ্যে ঐক্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কমিটি গঠনের উদ্যোগ নিলে কোন্দল আরো তীব্র আকার ধারণ করে। একটি গ্রুপ মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীর উপস্থিতি ব্যতীত কমিটি গঠন করা হলে তা কোনভাবেই মেনে নেবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। ফলে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দল আরো জটিল রূপ নিয়েছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের এ কোন্দল নিরসনে আজ (বুধবার) চট্টগ্রামে সংশ্লিষ্ট নেতাদের সাথে বিশেষ বৈঠকে মিলিত হবেন বলে জানা গেছে।

ছাত্রলীগের একাধিক সূত্র জানায়, চট্টগ্রামে চাঞ্চল্যকর 'এইট মার্ডার' ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত চট্টগ্রাম ছাত্রলীগকে একীভূত করে কমিটি গঠনের জন্য ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকনকে নির্দেশ দেন। গত এক দশক ধরে কমিটি বিহীন চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের লক্ষ্যে কোন্দল নিরসনের জন্য গত শনিবার

www.pathagar.com

ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক দ্বিতীয় দফা চট্টগ্রামে আসেন। শেখ হাসিনার নির্দেশে চট্টগ্রাম মহানগর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও মন্ত্রী এম এ মান্নান চট্টগ্রামে অবস্থান করেন। জানা যায়, মন্ত্রীর উপস্থিতিতেই অজয় কর খোকন চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে চট্টগ্রাম ছাত্রলীগের বিবদমান তিন গ্রুপের নেতা ও গ্রুপ প্রধানদের সাথে পৃথক পৃথক ও যৌথসভায় মিলিত হন। গত সোমবার সকাল পর্যন্ত দফায় দফায় মিটিং করেও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ কমিটির কোন রূপরেখা তৈরীতে ব্যর্থ হন। জানা যায়, ছাত্রলীগের আজম নাসির গ্রুপ ও মামুনুর রশীদ গ্রুপ একই কমিটি গঠন করতে সক্ষম হলেও মসিউর রহমান সমর্থিত গ্রুপ মেয়র মহিউদ্দিন চৌধুরীর উপস্থিতি ব্যতীত কমিটি গঠন কোনভাবেই মেনে নিতে রাজি নয়। এ গ্রুপ নেতাদের মতে, মেয়রের অনুপস্থিতিতে কমিটি হলে অন্য দু'টি গ্রুপ গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহ দখল করে নেবে। তাই মসিউর রহমান সমর্থিত গ্রুপ এখন কমিটি গঠন না করে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ছাত্রঐক্য গঠনের প্রস্তাব দিয়েছে। এদিকে ছাত্রলীগের এ প্রধান তিন গ্রুপের বাইরে আকতারুজ্জামান চৌধুরী বাবু সমর্থিত কাদের গ্রুপও গত কয়েকদিনে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। জানা যায়, এ গ্রুপের কয়েকজন নেতা অজয় কর খোকনের সাথে দেখা করে তাদেরকে নগর ছাত্রলীগের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে জোর দাবী জানিয়েছেন। ছাত্রলীগের বিবদমান গ্রুপসমূহের মধ্যে এ অনড় অবস্থানের কারণে কমিটি গঠন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, গ্রুপিংও আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। গত রবিবার রাতে সার্কিট হাউজে বিবদমান গ্রুপের যৌথ সভায় মন্ত্রী মান্নান ও ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদকের সামনেই ছাত্রলীগ নেতারা হাতাহাতিতে লিপ্ত হয় বলে জানা গেছে। কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে কোন্দল আরও ভয়াবহ রূপ ধারণ করায় গত সোমবার ঢাকায় ফিরে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর কাছে কমিটির কোন রূপরেখা প্রদান করতে পারেননি বলে জানা গেছে। এ প্রেক্ষিতে শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ নেতাদের কাছে আরও কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেন বলে জানা যায়। তিনি আজ বুধবার চট্টগ্রামে বিবদমান তিন গ্রুপের নেতাদের সাথেই বৈঠক করে সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন বলে জানা যায়। এ প্রেক্ষিতে কয়েকদিনের মধ্যেই কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম নগর কমিটি ঘোষণা করবে। এদিকে আগামীকাল বৃহস্পতিবার লালদিঘী ময়দানে ছাত্রলীগ ঘোষিত সমাবেশে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী সভাপতিত্ব করবেন। এ সমাবেশ থেকে দেশব্যাপী জামায়াত-শিবির উৎখাত কর্মসূচী ঘোষণা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ বিষয়ে আজ চট্টগ্রামের নেতাদের বিস্তারিত নির্দেশনা দিয়ে যাবেন বলে জানা গেছে। বহদ্দারহাটের এইট মার্ডার ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ লালদিঘীর এ সমাবেশের ডাক দেয়। ধারণা করা হচ্ছে, কমিটি গঠনের ক্ষেত্রেও আজ প্রধামন্ত্রীর নির্দেশনা ব্যর্থ হলে ছাত্রলীগের কোন্দল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে। জানা যায়, গত ১২ জুলাই বহদ্দারহাটে আজম নাসির গ্রুপের আট ক্যাডার হত্যার সংবাদে জেলখানায় কাদের গ্রুপ মিষ্টি বিতরণ করে উল্লাস করে। গত বছরে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী নিহত হয়েছে।

ইনকিলাব-১৯/৭/২০০০

www.pathagar.com

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের কোন্দল মেটাতে মনিটরিং সেল গঠন

চট্টগ্রাম অফিস ঃ বন্দরনগরী চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের সমস্ত কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করার জন্য ২৪ সদস্যের একটি মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। মহানগর ছাত্রলীগের দীর্ঘদিনের গ্রুপিং ও কোন্দল মিটিয়ে একটি বৃহত্তর ঐক্য সৃষ্টির অংশ হিসেবে এই সেল গঠিত হয়।

রোববার রাতে সার্কিট হাউসে নগর আওয়ামী লীগের সভাপতি, শ্রম ও কর্মসংস্থানমন্ত্রী এম এ মান্নান এবং ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অজয় করের সঙ্গে নগর ছাত্রলীগের বিদ্যমান তিন গ্রুপের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের প্রায় এক ঘন্টাব্যাপী রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর সেল গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এই ঐক্য প্রক্রিয়ার ব্যাপারে ৩ গ্রুপের নেতারাই ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, নগর ছাত্রলীগের সরকারি কমার্স কলেজ, এম ই এস কলেজ ও সিটি কলেজ গ্রুপ থেকে ৮ জন করে মোট ২৪ জন নেতাকে নিয়ে মনিটরিং সেল গঠন করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপের ৮ জন নেতার মধ্যে পুরানো নেতা থাকবেন ৪ জন এবং ছাত্র সংসদের বর্তমান ভিপি, জিএস ও কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক মিলে বাকি চারজন। পূর্ণাঙ্গ কমিটি হওয়ার আগ পর্যন্ত এই সেল কাজ করে যাবে।

সূত্র জানায়, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল বুধবার চট্টগ্রাম এলে ছাত্রলীগের ঐক্য প্রক্রিয়া ও কমিটি গঠন নিয়ে আলোচনা হবে। পরে কেন্দ্রীয় ও নগর আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে সবার পছন্দসই একটি কমিটি গঠন করা হতে পারে।

সার্কিট হাউসের বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, বৈঠকে ঐক্য প্রক্রিয়ার অন্যতম উদ্যোক্তা, নগর আওয়ামী লীগ নেতা আজম নাসির, কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতা বদিউল আলম, সীমান্ত তালুকদার এবং কমার্স কলেজ গ্রুপের হাসান মুরাদ, বিপ্লব, নাজমুল হক ডিউক, দিদারুল আলম, এম ই এস কলেজ গ্রুপের এম আর আজিম, মহিম উদ্দিন ও সিটি কলেজ গ্রুপের দিদারুল আলম মাসুম, জহিরুল ইসলাম চৌধুরী, দেবাশীষ পাল দেবু, গিয়াসউদ্দিন হিরু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে উপস্থিত কয়েকজন ছাত্রনেতা জানান, চট্টগ্রামে শুধু ছাত্রলীগ নয়, আওয়ামী লীগের রাজনীতিকে সুচারুভাবে পরিচালনা করতে হলে নতুন পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন ছাড়া বিকল্প নেই এবং এই কমিটি নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে আপ-টু-ডেট করতে হবে। সার্কিট হাউসের বৈঠকের পর ৩ গ্রুপের নেতা-কর্মীদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব বহুলাংশে দূর হয়েছে বলে তারা জানান।

ভোরের কাগজ- ১৮/৭/২০০০

www.pathagar.com

এইট মার্ডার ঃ রক্তের হোলিখেলার ধারাবাহিকতা

বহদ্দারহাট হত্যাকান্ডের ঘটনার পেছনে আরো ঘটনা রয়েছে

আজাদী প্রতিবেদন ঃ বহদ্দারহাট হত্যাকান্ডের ঘটনার পেছনেও ঘটনা রয়েছে। তদন্তে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিবেচনায় আনা উচিত বলে কয়েকটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে। সূত্রগুলো জানায়, মূলতঃ খুকু মনি নামটি দিয়েই শুরু হয় রক্তের হোলিখেলার প্রাথমিক পর্ব। খুকুমনির প্রকৃত নাম মহিবুল করিম সিদ্দিকী। খুকুমুনি ১৯৯৪ সালে ইউএসটিসিতে ফার্মেসী বিভাগে ভর্তি হয়। খুকুমনি শিবিরের সাথী ছিল। ইউএসটিসিতে খুকুমনির জনপ্রিয়তা ছিল। খুকুমনি নির্বাচনে এজিএস পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। শিবির খুকুমনিকে নির্বাচন না করার জন্য নির্দেশ দেয়। কিন্তু খুকুমনি নির্বাচন করে বিপুল ভোটে এজিএস নির্বাচিত হয়। শিবির পরবর্তীতে তার সাথী পদ বাতিল করে। ইউএসটিসি ও আশেপাশের এলাকায় খুকুমনির পরিচিতি ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকে এতে স্থানীয় কিছু সন্ত্রাসী এবং একজন ওয়ার্ড কমিশনারের নেতৃত্বাধীন একদল সন্ত্রাসী খুকুমনির আধিপত্য খর্ব করতে তৎপর হয়ে উঠে। এতে খুকুমনি একটি গ্রুপ গড়ে তোলে। ফাইভ স্টার জসীম, হাবিব, সাজ্জাদ, মুন্নাসহ বেশ কিছু তরুণকে নিয়ে সে ইট গ্রুপ সংগঠিত করে। ইসলামী ছাত্রশিবিরের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের কাছে খুকুমনির বেশ গ্রহণযোগ্যতা ছিল বলে জানা গেছে। একজন ওয়ার্ড কমিশনার এদেরকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে এবং এলাকায় প্রভাবশালী করে তোলার ক্ষেত্রে অবদান রাখে বলে জানা গেছে। ওয়ার্ড কমিশনার হওয়ার ক্ষেত্রেও এই গ্রুপটির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে বলে সূত্র জানায়। পরবর্তীতে উক্ত ওয়ার্ড কমিশনার ফাইব স্টার জসিম ও সাজ্জাদের পরিবারকে তার প্রতিদ্বন্দী ভাবতে শুরু করে। এক পর্যায়ে উক্ত কমিশনার খুকুমনির গ্রুপের ছেলেদের প্রত্যেককে একাধিক মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়। এসব মামলার আসামী হয়ে তাদেরকে এলাকা ত্যাগ করতে হয়। খুকুমনির গ্রুপটি আয়ুব আলীর নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের একটি অংশের সহযোগিতায় চান্দগাঁও এলাকায় এনাম, মনসুর ও শহীদ নামে ছাত্রলীগের ৩ কর্মীকে নৃশংসভাবে খুন করে। নিহত এনাম, মনসুর ও শহীদ ছাত্রলীগের এম ই এস কলেজ অংশের প্রতিনিধি ছিল। এই খুনের প্রতিশোধ নিতে ছাত্রলীগের উক্ত অংশটি মরিয়া হয়ে ওঠে। ট্রিপল মার্ডারের অল্প সময়ের ব্যবধানেই তারা তাদের প্রতিপক্ষের মূল মানুষটিকেই আঘাত করে বসে। তারা খুকুমনিকে খুন করে। খুকুমনি নিহত হওয়ার ঘটনায় ফাইভ স্টার জসীম, সাজ্জাদ, মুন্নাই তাদের গ্রুপটি ছাত্র শিবির এবং টপটেরর বলে পরিচিত ফটিকছড়ির নাসির বাহিনীও মানসিকভাবে ভেঙ্গে পড়ে। খুকুমনির হত্যাকান্ডের পর একটা যে বড় ধরনের হত্যাকান্ড সংঘটিত হবে এ ব্যাপারে ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দ প্রায় নিশ্চিত ছিল। মুন্না, সাজ্জাদ, হাবিব ফাইভ স্টার জসিমরা খুকুমনির লাশ ছুঁয়ে প্রতিশোধ নেয়ার শপথ গ্রহণ করে। খুকুমনি হত্যাকান্ডে একজন ওয়ার্ড কমিশনারের সম্পৃক্ততা রয়েছে তা নিশ্চিত হয়ে লিয়াকত আলীর মত একজন প্রভাবশালী কমিশনারকে তারা খুন করে। এম ই এস কলেজের সুনীল, কায়সার, দুলু, কানা

www.pathagar.com

বক্কর ও আরও অনেককে তাদের প্রতিপক্ষ হিসাবে চিহ্নিত করে। এরই সুযোগ নেয় আয়ুব আলীর নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের একটি অংশ। আয়ুব আলী হাবিব ও সাজ্জাদের মাধ্যমে এম ই এস কলেজে তার অপমানিত হওয়ার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকে। এক পর্যায়ে তারা কানা বক্করকে সুনীলদের গ্রুপ থেকে ভাগিয়ে আনতে সফল হয়। সূত্র জানায়, কানা বক্করের সহযোগিতায় লালখান বাজার ডেড়ারপাড়ে হাবিব, সাজ্জাদরা বাসা নেয় এবং এম ই এস কলেজ ছাত্রলীগের নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত এলাকায় একটি শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। এই এলাকায় অবস্থান নিয়ে তারা কায়সারকেও হত্যা করে বলে জানা গেছে, তাদের প্রতিপক্ষ ছাত্রলীগের অংশটি জানতে পারে যে খুকুমনি গ্রুপের মুন্নার গুলিতেই লিয়াকত কমিশনার নিহত হয়। তারা মুন্নাকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায়। তারা কৌশলে এক তরুণের মাধ্যমে মুন্নাকে কক্সবাজার নিয়ে যায়। কক্সবাজার সৈকত এলাকার গহীন জঙ্গলে ছাত্রলীগের ঐ অংশটি মুন্নাকে খুন করে বলে জানা গেছে। এর বদলা হিসাবে এক চাকমা তরুণকেও কক্সবাজারে খুন করা হয়।

এদিকে অপর একটি সূত্র জানায়, হাবিব-সাজ্জাদের সাথে একজন নগর আওয়ামী লীগ নেতার সাথেও সখ্যতা ছিল। উক্ত নেতা হাবিবদের কাছ থেকে একটি একে-৪৭ উপহার পান বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। একটি বেসরকারী কলেজের নির্বাচন নিয়ে উক্ত নেতার সাথে হাবিবদের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ফলে ছেঁড়া আকবরের গ্রুপের সাথে হাবিবদের যোগাযোগ ঘটে। একজন নগর আওয়ামী লীগ নেতাকে কোণঠাসা করা এবং তাহের গ্রুপ প্রতিরোধ করার লক্ষ্যে হাবিব, সাজ্জাদদেরকে নানাভাবে ব্যবহারের সুযোগ খুঁজতে থাকে। ছেঁড়া আকবরের গ্রুপটি এই প্রস্তাব হাবিবদেরকে জানায়। তারা আরও জানায় যে, নগর আওয়ামী লীগ নেতার উক্ত গ্রুপের সাথে এম ই এস কলেজ গ্রুপের সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি হয়েছে এবং উভয় গ্রুপের নেতা-কর্মীদের যাতায়াত রয়েছে। তারা সম্মিলিতভাবে কালামিয়া বাজারে কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে এবং আশেপাশের এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনা নিয়েছে বলে হাবিবদেরকে বুঝানো হয়। কখন তারা কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউটে যাবে এবং কমিটি গঠন করবে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্য তারা দেবে বলে জানায়। ঐ অংশের সাথে ছেঁড়া আকবরদের একজন ইনফরমার রয়েছে বলে আশ্বস্ত করে। এ অনুসারে তারা এক দিন হাবিবদেরকে তথ্য প্রদান করে এবং হাবিবরা প্রতিরোধ কল্পে তাদের কাছ থেকে একে-৪৭ সহ বেশ কিছু অত্যাধুনিক অস্ত্র পাবে বলে জানায়। ছেঁড়া আকবরদের প্রস্তাব নিয়ে হাবিবরা একজন শিবির নেতার সাথে যোগাযোগ করে। একটি সূত্র থেকে জানা গেছে উক্ত শিবির নেতা হত্যাকান্ড না ঘটিয়ে তাদেরকে প্রতিরোধের সম্মতি প্রদান করে। সম্মতি পেয়ে হাবিব, সাজ্জাদ, সোলায়মান, ইমন, মোসলেহ সহ আরও ৩ জন তরুণ উত্তর জেলার একটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের বাসায় একত্রিত হয়। তারা ছেঁড়া আকবরদের এবং তাদের একজন ইনফরমারের খবর পাওয়ার জন্য মোবাইলে রিং বাজার অপেক্ষায় থাকে। ছেঁড়া আকবরদের একটি গ্রুপ একটি মাইক্রোবাসে দুটি মাইক্রোবাসকে অনুসরণ করেছিল বলে সূত্রগুলো জানায়। খবর পেয়ে হাবিবরা মাইক্রোবাসে করে খাজা

www.pathagar.com

রোডের মুখে উপস্থিত হয়। তারা খবর পায় একটি মাইক্রোবাসে মেহেদি, শফি এবং নগরের একজন টপটেরর রয়েছে। তারা মাইক্রোবাস লক্ষ্য করে গুলী চালাতেই উক্ত মাইক্রোবাসের দরজা খুলে অজ্ঞাতনামা একজন এক রাউন্ড গুলী ছোঁড়ে। সাজ্জাদরা তাদের প্রতিপক্ষ অত্যাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত বলে আশংকা করে এলোপাথাড়ি ব্রাশ ফায়ার করে। মুহূর্তেই ৮টি তাজা প্রাণ ঝরে পড়ে। সাজ্জাদরা যাওয়ার সময় একটি একে-৪৭ নিয়ে যায় বলে ঐ সূত্রটি জানায়।

এদিকে অভিজ্ঞ মহল এই রক্তের হোলিখেলার ধারাবাহিকতা বহদ্দরহাট হত্যাকান্ডের তদন্তে বিবেচনায় আনা উচিত বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। মামলাটির আইনগত বিচার না করে রাজনৈতিক বিচার করা হলে প্রকৃত হত্যাকারীরা এবং হত্যাকান্ডের মদদদাতারা সাজা পাবে না বলে তারা জানায়। এই মামলায় সম্ভাব্য হত্যাকারীদের এবং চিহ্নিত ক্যাডারদের আসামী না করে রাজনৈতিক মামলার মতই গতানুগতিকভাবে ৩০ জনকে আসামী করে মামলাটি হালকা করা হয়েছে বলে তারা জানায়। এমন কয়েকজনকে মামলায় আসামী করা হয়েছে যারা হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না মর্মে পুলিশও নিশ্চিত হয়েছে বলে একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানায়। তৌফিক নামে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের একজন ছাত্র ১২ জুলাই প্রক্টরের কক্ষে সভায় অংশগ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাকেও এই মামলার আসামী করা হয়েছে।

এদিকে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নগর সভাপতি এটিএম মিজবাহুল কবীর গতকাল টেলিফোনে এই প্রতিবেদককে জানান, কিলারদের বরাত দিয়ে শিবির নেতৃবৃন্দ এবং চট্টগ্রাম কলেজকে জড়িয়ে যা প্রচার করা হচ্ছে তা মিথ্যা, ভিত্তিহীন এবং ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সাজানো। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম কলেজের শেরে বাংলা ছাত্রাবাসের দ্বিতীয় তলার কক্ষগুলো উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য বরাদ্দ। সুতরাং সেখানে কোন বৈঠক করার প্রশ্ন উঠে না। সরকার বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে দমন করা এবং ছাত্রলীগকে পুনর্বাসন করাই এর লক্ষ্য, সোলেমানকে ঢাকায় নিয়ে গিয়ে বক্তব্য সাজানো হচ্ছে। সোলেমানের চট্টগ্রামের এবং ঢাকার বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্যই এর প্রমাণ বলে তিনি জানান। তিনি আরও বলেন, ঢাকায় ১৬৪ ধারায় বক্তব্য নেয়া এবং দিনের পর দিন সেখানে রেখে দেয়া ষড়যন্ত্রের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বহন করবে। তিনি রাজনৈতিক হীন স্বার্থ চরিতার্থ না করে হত্যাকান্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করেন।

দৈনিক আজাদী- ৫/৮/২০০০

বিঃদ্রঃ উল্লেখ্য যে এ রিপোর্টটি ছাপা হওয়ার পরে রহস্যজনকভাবে প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

www.pathagar.com

উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে ঃ জামায়াতে ইসলামীও ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর দোষ চাপানোর ষড়যন্ত্র

বহদ্দার হাটে ছাত্রলীগের ক্যাডার বাহিনীর অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ৮ জন নিহত হবার পর আওয়ামী লীগ গভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। তারা তাদের রাজনৈতিক ও আদর্শিক প্রতিদ্বন্দ্বি জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র শিবিরকে হেয় প্রতিপন্ন ও নিশ্চিহ্ন করার চক্রান্ত করে। এই চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্যে তারা বন্দারহাট হত্যাযজ্ঞের সাথে ছাত্রশিবিরের জড়িত থাকার বানোয়াট কল্প কাহিনী এক'শ মুখে প্রচার করতে থাকে।

অপর দিকে গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থেকে প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে ও পরে ৭৬ কেজি ওজনের দুটি বোমা আবিস্কৃত হয়। (অবশ্য প্রধানমন্ত্রীর কেরামতিতে আগের এবং পরের কোনো একটি বোমাও ফোটেনি।)

এই বোমা পুঁতে রাখার ঘটনাটিও উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপানো হয়। এর জন্যেও পরোক্ষভাবে দায়ী করা হয় জামায়াত শিবিরকে।

এই দুটি ঘটনা কারা ঘটিয়েছে তা নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে উদঘাটন করার আগেই আওয়ামী মহল থেকে জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার হাস্যকর দাবি উঠানো হয়। প্রধানমন্ত্রীসহ গোটা আওয়ামী পন্থীরা মুখ থেকে কলের গানের মতো একই কথা বাজতে থাকে।

তাদের এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য আপাতত জামায়াত-শিবির হলেও সাথে সাথে আক্রমণ চলতে থাকে –

- পুলিশ বাহিনীর উপর,
- বিচারকদের উপর,
- আইনজীবীদের উপর
- আলেম উলামাদের উপর

দেখুন পত্র পত্রিকার খবর :

রাজাকারদের বাড়াবাড়ি আর সহ্য করা হবে না প্রয়োজনে পাল্টা আঘাত হানতে হবে — প্রধানমন্ত্রী

চট্টগ্রাম থেকে বাসস ঃ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছেন, রাজাকারদের বাড়াবাড়ি আর সহ্য করা হবে না, প্রয়োজনে পাল্টা আঘাত হানতে হবে।

তিনি গতকাল চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সাথে মতবিনিময়কালে একথা বলেন।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা বলেন, চট্টগ্রামে বার বার এ ধরনের ঘটনা ঘটছে। আমরা কি বার বার এভাবে মার খাবো? এরপরও কি আমরা চুপ করে থাকবো, না প্রতিরোধ করবো? আমরা অবশ্যই প্রতিরোধ করবো। আর এজন্য চাই ঐক্য। দল যদি ঐক্যবদ্ধ থাকে, তাহলে কেউ এ ধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস পাবে না। ঘটালেও পাল্টা আঘাত হানা সম্ভব হবে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায়, তারপরও রাজাকাররা শক্তি সাহস পায় কোথায়? কারা তাদের মদদ দিচ্ছে, সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন চট্টগ্রামে কি আওয়ামী লীগ মরে গেছে? আওয়ামী লীগ মরেনি, এটা আবার প্রমাণ করার সময় এসেছে। রাজাকারদের হাতে আমরা আর মার খেতে চাই না, পাল্টা আঘাত করতে চাই।

(ইনকিলাব ২০/৭/২০০)

প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্ন ঃ চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ কি শাড়ি চুড়ি পরে বসে আছে নকশালী দমনের মতো ব্যবস্থা নিন

জসীম চৌধুরী সবুজ, চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে বর্বরোচিত এইট মার্ডার ঘটনার আটদিন পরও পুলিশ আসল খুনিদের কাউকেই গ্রেফতার করতে না পারায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। পুলিশের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, না পারলে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে চলে যান। ব্যর্থতার কাহিনী আমি শুনতে চাই না। আসামি ধরতে গিয়ে প্রয়োজনে গুলি চালাতে হলে চালান। কলকাতায় যেভাবে নকশালীদের দমন করা হয়েছে সেভাবে কাজ করুন।

আওয়ামী লীগের মহানগর, উত্তর ও দক্ষিণ জেলা এবং অঙ্গসংগঠন নেতাদের সঙ্গে ৫ ঘন্টাব্যাপী রুদ্ধদ্বার বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ কি মরে গেছে? আপনারা কি সবাই শাড়ি, চুড়ি পরে বসে আছেন? আমরা কি রাজাকারদের হাতে এভাবে একের পর এক মার খেয়ে যাব? দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রামে আপনাদের সম্পর্কে আমি নানারকম কথা শুনি, এ সব বন্ধ করেন। তা না হলে আজ ছাত্রলীগ খেয়েছে, কাল যুবলীগ খাবে, কেউ পার পাবেন না। তিনি বলেন, কারা এসব কাজে সাহস যোগাচ্ছে তাও দেখতে হবে। চট্টগ্রামের হত্যাকারীরা কেন ধরা পড়ে না তাও রহস্যজনক। তিনি বলেন, আইন যদি নিজস্ব গতিতে না চলে তাহলে আপনাদের তা দেখতে হবে। এজন্য ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। নিজেদের শক্তি বাড়াতে হবে। নিজেদের বিভেদ ভুলে যান। দুর্বৃত্তদের রুখতে ঐক্যবদ্ধ হোন।

চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি করে যারা নেতা হতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসব করে জনগণের আস্থা অর্জন করা যায় না। আওয়ামী লীগে এ ধরণের নেতার দরকারও নেই। কোন ব্যক্তি বিশেষকে রক্ষা করতে গিয়ে সরকার বা দলের ভাবমূর্তিও আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে দিতে পারি না। যতবড় নেতাই হোন দলের জন্য প্লাস পয়েন্ট না হলে, দলে সমস্যা সৃষ্টি করলে তাকে আমরা দলে রাখব না।

যুগান্তর ২০/৭/২০০০

www.pathagar.com

পুলিশের অদক্ষতায় প্রধানমন্ত্রীর তীব্র অসন্তোষ

চট্টগ্রামে আ. লীগ কি মরে গেছে যে রাজাকাররা আমাদের মেরে যাবে?

চট্টগ্রাম অফিস : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন, যে পুলিশ জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দিতে পারছে না, তাদের চাকরি করার কোনো অধিকার নেই। গত ১২ জুলাইয়ের হত্যাকাণ্ডের খুনিদের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, কোনো অজুহাত চলবে না, আমি দেখতে চাই ওরা ধরা পড়েছে।

দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে পৃথক সভায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ কি মরে গেছে যে রাজাকাররা আমাদের মেরে যাবে? ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি বলেন, আর যদি একটা লাশ পড়ে তবে ভবিষ্যতে ১০টা লাশ পড়বে।

দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জামায়াত-শিবিরকে ইঙ্গিত করে বলেন, তাদের হাতে আর মার খেতে চাই না। চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতারা কি শাড়ি-চুরি পরেন? তারা কি মরে গেছেন? আর যদি একটা লাশ পড়ে তবে ভবিষ্যতে ১০টা লাশ পড়বে। এ ধরণের কথা আমি আগে কখনো বলিনি। কিন্তু এখন বলতে বাধ্য হচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী এ বক্তৃতা দেওয়ার সময় উপস্থিত সাংবাদিকদের সেখান থেকে চলে যেতে বলা হয়।

দীর্ঘ পাঁচ ঘন্টা ধরে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আওয়ামী লীগ চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সহসভাপতি নূরুল ইসলাম বিএসসি, যুগ্ম সম্পাদক সেকান্দর হায়াত খান, মুক্তি যোদ্ধা এনামুল হক, উত্তর জেলা কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক গিয়াসউদ্দিন, দক্ষিণ জেলার সহসভাপতি এম এম আবুল কালামসহ ৪০ জন বক্তব্য রাখেন। বৈঠকে চট্টগ্রাম উত্তর, দক্ষিণ ও মহানগর আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দলের অনৈক্য দূর করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধা এনামুল হককে অন্য নেতারা বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে প্রধানমন্ত্রী ক্ষেপে যান এবং তাকে বক্তৃতা দেওয়ার সুযোগ দেন। এরপর প্রধানমন্ত্রী দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, ঐক্যবদ্ধভাবে সবাইকে কাজ করতে হবে। চাঁদাবাজি করে নেতা হওয়া যায় না। দলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের ভবিষ্যতে দল থেকে বের করে দেওয়া হবে। আগামী নির্বাচনে বেছে বেছে প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া হবে বলেও দলীয় প্রধান মন্তব্য করেন।

ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী বলেন, তারা একের পর এক খুন করে যাচ্ছে। কতদিন আমরা এসব সহ্য করব? তিনি বলেন, তাদের বাড়াবাড়ি আর সহ্য করা হবে না। দলের সব অনৈক্য ঝেড়ে ফেলে রাজাকারদের প্রতিরোধের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা ঐক্যবদ্ধ না হলে তারা কাউকে ছাড়বে না। ছাত্রলীগ দিয়ে শুরু করেছে, পর্যায়ক্রমে তারা যুবলীগ, আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদেরও খুন করবে। তিনি বলেন, আট খুনের পর তারা আবার ছাত্রলীগের মিছিলে হামলা করেছে। এত সাহস তারা পায় কোথায়? ঘটনার এক সপ্তাহ পরও কাউকে গ্রেপ্তার না করায় পুলিশের সমালোচনা করে তিনি বলেন, এটা অকল্পনীয়,

www.pathagar.com

পুলিশ তল্লাশি চালানোর আগেই তথ্য ফাঁস হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী গত চার বছরে সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিয়ে বলেন, আমরা জনগণের আস্থা অর্জন করেছি। কিন্তু একটি হত্যা আমাদের অনেক অর্জন ম্লান করে দেয়।

প্রথম আলো ২০/৭/২০০০

নাঙ্গলকোর্টের সমাবেশে শেখ হাসিনা

জামায়াত-শিবির চক্রকে যেখানে পাবেন প্রতিরোধ করুন

নাঙ্গলকোট থেকে ফিরে কুদরাত-ই-খোদা ঃ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, জেনারেল জিয়া মুক্তিযোদ্ধা হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে বেঈমানি করেছেন। তার সময়েই জামায়াত-শিবিরের উত্থান ঘটেছে। চট্টগ্রামে সাম্প্রতিক হত্যাকান্ডের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতাবিরোধী চক্র জামায়াত-শিবিরকে যেখানে পাবেন সেখানেই প্রতিরোধ করবেন।

সংবাদ ১৬/৭/২০০০

বাংলাদেশ থেকে জামায়াত-শিবির উৎখাতের অঙ্গীকার

চট্টগ্রাম শহরকে লাশের স্তূপে পরিণত করা হবে ঃ ছাত্রলীগ

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ গতকাল বৃহস্পতিবার লালদীঘি ময়দানের সমাবেশ থেকে ছাত্রলীগ নেতারা বলেন, বাংলাদেশের ৫৫ হাজার বর্গমাইল থেকে জামায়াত-শিবিরকে উৎখাত করতে হবে। রক্তের বদলা আমরা রক্তেই নেবো। দেড় বছর পর ছাত্রলীগ চট্টগ্রাম মহানগরীতে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এরপর হামলা করা হলে চট্টগ্রাম শহরকে লাশের স্তূপে পরিণত করা হবে। বহদ্দারহাট হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আয়োজিত সমাবেশে নগরীর ছাত্রলীগ তিন গ্রুপ আলাদা আলাদা মিছিল নিয়ে আসে। মিছিলে শ্লোগান ছিল "জামাত ধর জবাই কর। শিবির ধর জবাই কর।" এমইএস কলেজের ছাত্রলীগ মামুন গ্রুপের মাথায় সাদা পট্টি সিটি কলেজের ছাত্রলীগ মসিউর গ্রুপ লাল পট্টি ও আইন কলেজসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে আজম নাসির গ্রুপ হলুদ পট্টি মাথায় বেঁধে সমাবেশে উপস্থিত হয়। এছাড়া অন্য এক গ্রুপ "একটা দুটা শিবির ধর সকাল বিকেল নাস্তা কর" শ্লোগানসহ হাতে হকিস্টিক দিয়ে মিছিল করে। মূলত: প্রতিটি গ্রুপকেই কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ নেতাদের সামনে তার শক্তি প্রদর্শনে ব্যস্ত দেখা যায়।

বহদ্দারহাটে এইট মার্ডারের পর থেকে গত এক সপ্তাহ থমথমে নগরী গতকাল ছাত্রলীগের সমাবেশকে ঘিরে আতংকিত ছিল। ছাত্রলীগের দলীয় কোন্দলে বড় ধরনের সংঘর্ষ এড়াতে পুলিশ সমাবেশস্থলের আশপাশের মহল্লা, কমপ্লেক্স, পাবলিক লাইব্রেরী, জেলা পরিষদ ভবনে পুলিশী পাহাড়া বসায়। সভা শুরুর পর থেকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদেরকে বিভিন্ন গ্রুপ শামাল দিতে দেখা যায়। দলীয় কোন্দলের ভয়ে গত এক সপ্তাহের মতো গতকালের

www.pathagar.com

সমাবেশের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করেন ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন মঞ্চে ছাত্রলীগের তিন গ্রুপের নেতাদের দেখিয়ে বলেন চট্টগ্রামের ১২ জন নেতা আজ ঐক্যবদ্ধ।

দিনকাল ২১/৭/২০০০

লালদিঘীর বিশাল সমাবেশে নাসিম

জামায়াত-শিবির উৎখাতে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

কেরামত উল্লাহ, চট্টগ্রাম থেকে ফিরে ঃ একই সাথে ৮ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করার পরও শিবির কর্মীদের গ্রেফতার করতে না পারায় চট্টগ্রামের পুলিশ কর্তাদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম। বললেন, ফাইনাল নির্দেশ আপনাদের কোন বাহানা শুনতে আমি রাজি নই। মনোযোগ দিয়ে কাজ করুন। দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে, শিগ্‌গির খুনিদের ধরতে না পারলে ব্যাগ গুছিয়ে আপনাদের পাঠিয়ে দেয়া হবে। গতকাল শুক্রবার চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে আইন শৃংখলা রক্ষাকারী উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তাদের এক জরুরী সভায় তিনি একথা বলেছেন। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন এবং শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রী এম এ মান্নান ছাড়াও ঐ সভায় পুলিশের আইজি মোহাম্মদ নূরুল হুদা, চট্টগ্রামের ডিআইজি নজরুল ইসলাম, সিআইডির ডিজি কাজী নজরুল উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাবাজার - ১৫/৭/২০০০

হুকুমের দরকার নেই ঃ
জামায়াত শিবিরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ুন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও পানি সম্পদ মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, জামায়াত-শিবিরকে রুখার জন্য আর হুকুমের প্রয়োজন নেই, এক্ষুনি ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে অন্যথায় আপনারা বেঈমানে পরিণত হবেন। আর বেঈমানদের এ জাতি কখনো ক্ষমা করে না, করবেও না। মন্ত্রী গতকাল (শুক্রবার) নগরীর সিদ্ধেশ্বরীস্থ বালুর মাঠে রমনা থানা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতাকালে এ কথা বলেন।

ইনকিলাব- ২২/৭/২০০০

www.pathagar.com

জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত– স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

নজরুল ইসলাম মিঠু, চট্টগ্রাম থেকে ফিরে ঃ চট্টগ্রামে জামাত-শিবিরের ব্রাশফায়ারে ছাত্রলীগের ৬ জন নেতাসহ ৮ ব্যক্তি নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার দুদিন পর গতকাল শুক্রবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, মৌলবাদ জামাত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। তিনি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সরাসরি জড়িতদের এবং ঘাতকদের মদদদাতা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষক ও পরিকল্পনাগ্রহণকারীদের গ্রেপ্তার করে এক মাসের মধ্যে চট্টগ্রামকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে পুলিশের প্রতি কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন।

ভোরের কাগজ- ১৫/৭/২০০০

মন্ত্রীসভায় আলোচনা

জামায়াত-শিবিরকে কঠোর হাতে দমন করার সিদ্ধান্ত

শাহনেওয়াজ ঃ মন্ত্রীসভার বৈঠকের অনানুষ্ঠানিক আলোচনায় জামায়াত-শিবিরকে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে কঠোর হাতে দমন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। একইসঙ্গে দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে যে কোন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

গতকাল সোমবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকের মূল বিষয়ের পর গত বুধবার চট্টগ্রামে শিবিরের নির্মম হত্যাকাণ্ড ও গত রোববার যশোরে সন্ত্রাসীদের হাতে একজন সাংবাদিকের হত্যাকাণ্ডের ওপর আলোচনা করতে গিয়ে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, চট্টগ্রামের ঘটনা প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্রপাত করতে গিয়ে কোন কোন মন্ত্রী উল্লেখ করেন, জামায়াত-শিবির বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে একসময় ষড়যন্ত্র করেছে, হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। এ সাহস তারা পায় কোথায় তা অনেকেরই জানা। এদের বিদেশ থেকে গোপন পথে প্রচুর অর্থ ও অস্ত্র আসে। অথচ এই জামায়াত-শিবিরের সঙ্গে বিরোধী দল আঁতাত করে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করছে।

জনৈক সিনিয়র মন্ত্রী আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেছেন, জামায়াত-শিবিরকে আর কোনভাবেই ছাড় দেয়া যায় না। উচিতও হবে না। দেশটি স্বাধীন করা হয়েছে রাজাকার-আলবদরদের হাতে মার খাওয়ার জন্য নয়। তিনি কথাপ্রসঙ্গে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিষয়টি আলোচনায় নিয়ে আসেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাসী কার্যকলাপ আর এ দেশের মাটিতে চলতে দেয়া হবে না। রাজনৈতিকভাবে এদের রুখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রচারণা ও অভিযান। এই জামায়াত-শিবিরচক্র যেন কোনভাবে, কোথাও ঠাঁই না পায় সে ব্যাপারে

www.pathagar.com

সবাইকে আবার সোচ্চার হতে হবে। প্রয়োজনে প্রশাসনিকভাবেও এদের মোকাবিলা করতে হবে।

গত রোববার যশোরে সন্ত্রাসীদের হাতে সাংবাদিক শামছুর রহমান নৃশংসভাবে নিহত হওয়ার ঘটনায় মন্ত্রীসভা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আলোচনায় উল্লেখ করা হয়, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ যে কোন মূল্যে রোধ করা হবে। সরকার সন্ত্রাসীদের কঠোর হাতে দমন করবে, তারা যে দলেরই হোক না কেন।

মন্ত্রিসভা বৈঠকে বৃহত্তর ঢাকার যানবাহন পরিকল্পনা ও সমন্বয় বোর্ড আইন-২০০০ প্রণয়নের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হয়।

যুগান্তর- ১৮/৭/২০০০

জামায়াত-শিবিরকে আঘাত করে বিরোধী জোটকে চাপে রাখতে আওয়ামী লীগের কৌশল

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ চট্টগ্রামে ছয়জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীসহ আটজনের হত্যাকারী শিবির ক্যাডাররা- এই সাধারণ অভিযোগের পটভূমিতে আওয়ামী লীগ জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে রাজনৈতিক প্রচারাভিযানের উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য দলীয় কর্মসূচির বাইরে একই দাবিতে নানা শ্রেণী-পেশার সংগঠনকেও মাঠে নামানো হবে। জামায়াত-শিবিরকে কোনঠাসা করতে এই আন্দোলন হলেও এর পেছনে রয়েছে চারদলীয় জোটের বিরোধীদলীয় রাজনীতির ওপর নেতিবাচক চাপ প্রয়োগ করা।

সাংবাদিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার সময় তিনি এমনও মন্তব্য করেছেন, 'পড়ে পড়ে কি শুধু মার খাব?' ওইদিন রাতেই তিনি কয়েকজন সাবেক ছাত্রনেতার সঙ্গে বৈঠক করে জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করার নির্দেশ দেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এমন তিনজন সাবেক ছাত্রনেতার সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে সাবেক ছাত্রনেতাদের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময়ের নির্দেশ দেন।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আবদুর রহমান, অসীম কুমার উকিল, ইকবালুর রহিম, শফি আহমেদ, এস এম কামাল হোসেন, এনামুল হক শামীম, ইসহাক আলী খান পান্না এবং ছাত্রলীগের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন। এই বৈঠকে জামায়াত-শিবিরের পাশাপাশি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে তোলার জন্য প্রধানমন্ত্রী সাবেক ছাত্রনেতাদের নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে গত শনিবার সাবেক ছাত্রনেতাদের এক সভা আওয়ামী ফাউন্ডেশনে হয়েছে। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে

www.pathagar.com

জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে গতকাল একটি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। গতকাল এসব সাবেক ছাত্রনেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী ও কয়েকজন সংস্কৃতিসেবীর সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন। পরবর্তী সময়ে আরো বড় আকারে এই মতবিনিময় করা হবে বলে গতকালের সভা সূত্রে জানা গেছে।

আগামী জাতীয় নির্বাচনে চার বিরোধীদলীয় জোটকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার কৌশল নিয়েছে আওয়ামী লীগ। এই কৌশলের অংশ হিসেবেই চট্টগ্রামের ঘটনাকে সামনে রেখে সারা দেশে একটি জামায়াত-শিবির বিরোধী জনমত গড়ে তুলতে চায় ক্ষমতাসীন দলটি। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা পালনকারী জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট বাঁধার কারণে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টিকেও স্বাধীনতাবিরোধী পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হতে চায় আওয়ামী লীগ।

আওয়ামী লীগের এই উদ্দেশ্য থেকেই সকল মুক্তিযোদ্ধাকে একটি মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এর আগে সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে। এই ফ্রন্টের উদ্যোগে ইতিমধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা জনতা সমাবেশ হচ্ছে। এসব মহাসমাবেশের পাশাপাশি এখন জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার আন্দোলন জোরদার করা হবে।

এদিকে গত শনিবার রাতে ছাত্রলীগ কর্মীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ড: ফজলে রাব্বী হলে ছাত্রশিবিরের কর্মীদের কয়েকটি কক্ষে হামলা চালিয়েছে। গত দু-তিন দিনে চট্টগ্রামের মিরসরাই, সুনামগঞ্জ জেলার সরকারী কলেজ ছাত্রাবাস, গাইবান্ধার গোবিন্দ, রংপুরের পীরগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও পাবনায় ছাত্রলীগ কর্মীদের সঙ্গে শিবির কর্মীদের ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার খবর পাওয়া গেছে। চট্টগ্রামের ছয়জন ছাত্রলীগ কর্মী খুন হওয়ার প্রতিবাদে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগের প্রতিবাদ সভা, সমাবেশ, মিছিল আয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে এসব ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে।

প্রথম আলো- ১৭/৭/২০০০

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীর তীব্র প্রতিবাদ

জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর প্রতিবাদ

ঢাকা, ১৩ই জুলাই, ২০০০ ইং

"গতকাল আওয়ামী ছাত্র লীগের নিজেদের উপদলীয় কোন্দলে ব্রাশ ফায়ারে চট্টগ্রামে ৮ জন নিহত হওয়ার বর্বর ঘটনার আমি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার নির্যাতন এবং সরকারী দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগের ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতারও আমি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকার ইসলামী ছাত্র শিবিরের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার নির্যাতন এবং উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে সরকার আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের হীন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এ ঘটনার সাথে ইসলামী ছাত্র শিবিরের জড়িত থাকার অভিযোগ করা হচ্ছে।

দেশবাসী সকলেই অবগত আছেন যে আওয়ামী ছাত্র লীগ আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে ক্ষত বিক্ষত। আওয়ামী ছাত্র লীগের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষে যেখানে প্রতিনিয়তই তারা এক গ্রুপ অন্য গ্রুপকে খুন করছে সেখানে চট্টগ্রামে গতকাল সংঘটিত ঘটনাও আওয়ামী ছাত্র লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলেই সংঘটিত হয়েছে বলে জনমনে বদ্ধমূল ধারণা। অথচ অন্যের উপর দোষ চাপিয়ে সরকারী দল সর্বত্র উত্তেজনা ছড়াচ্ছে। বহদ্দারহাট পুলিশ ফাঁড়ির ২৫০ গজের মধ্যে এ রকম একটি মারাত্মক ঘটনা ঘটার সময় পুলিশ রহস্যজনকভাবে নিষ্ক্রিয় ছিল বলে ঐ এলাকাবাসী পর্যবেক্ষণ করেছে। পুলিশের নিরাপদ আশ্রয় থেকে পর্যবেক্ষকের মত ভূমিকা পালন থেকেই স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে এ ঘটনা আওয়ামী ছাত্র লীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফল এবং জনগণের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার উদ্দেশ্যেই ইসলামী ছাত্র শিবিরকে এ ঘটনার সাথে জড়িত করার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

বহদ্দারহাটের ঘটনার জের ধরে একজন জামায়াত কর্মী মাহমুদুর রহমানকে (৪০) তার দোকান থেকে ধরে নিয়ে পৈশাচিকভাবে হত্যার ঘটনারও আমি তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি।

১৪ই জুলাই, বিকেল ৫টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক সংসদীয় দলনেতা মাওলানা মতিউর রহমান নিজামীর বক্তব্য ঃ

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আস্‌সালামু আলাইকুম। জরুরীভাবে আপনাদেরকে ডেকেছি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য জানানোর জন্য। আপনারা অবহিত আছেন যে গত ১২ই জুলাই চট্টগ্রামে

www.pathagar.com

সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আভ্যন্তরীণ কোন্দলকে আড়াল করার জন্য জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে জঘন্য মিথ্যাচার চালানো হচ্ছে। আট খুনের এই বর্বরোচিত ঘটনা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক, দুঃখজনক। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করি ও দোষীদের শাস্তি দাবী করি এবং এজন্য অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করছি।

পুলিশ বাক্সের মাত্র ২০০ গজের মধ্যে প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘটিত এই হত্যাকাণ্ডই প্রমাণ করে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির কতটা অবনতি ঘটেছে। সরকার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। সরকারীদলের নেতাদের গডফাদার এর ভূমিকা পালন করা এবং সন্ত্রাসে প্রত্যক্ষ মদদদানের কারণেই আজ দেশে এই অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, গত ১২ই জুলাই চট্টগ্রামে সংঘটিত ঘটনা ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগের দলীয় কোন্দলের ফসল। আগের দিন ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের বন্দুক যুদ্ধে তিনজন নেতা-কর্মী মারা যায়। পুলিশ পাশেই ছিল। পরে তারা তিনটি লাশ, দুটি মটর সাইকেল ও অনেক আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। এ খবর ১২ই জুলাইয়ের জাতীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। আর ১২ই জুলাই সকাল এগারটায় সংঘটিত হয় ৮ জনের নৃশংস হত্যাকাণ্ড। এই ঘটনা ১৯৭৪ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকা কালে ছাত্রলীগের উপদলীয় কোন্দলে মহসিন হলের করিডোরে ৭ খুনের মর্মান্তিক ঘটনার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। দলীয় কোন্দলে মানুষ খুনের ঘটনা আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের জন্য কোন নতুন ঘটনা নয়। দূর অতীতে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সাম্প্রতিক কালের ঘটনা প্রবাহই প্রমাণ করে যে সরকারীদল ও তাদের অঙ্গ সংগঠনগুলো উপদলীয় কোন্দলে ক্ষতবিক্ষত।

সাম্প্রতিক পত্রপত্রিকার পাতায় প্রতিনিয়ত সরকারী ছাত্রলীগের দলীয় কোন্দলে হত্যা-সন্ত্রাস ও সংঘাতের ঘটনা প্রকাশিত হচ্ছে এবং এ সম্পর্কে আপনারা বেশ ভালো ভাবেই অবহিত। বিগত ঈদুল আজহার আগের দিন চট্টগ্রামেই আওয়ামী লীগের অন্তর্দলীয় কোন্দলে নাসির গ্রুপ ও কাদের গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হয় একজন। এর বদলা হিসাবে ঈদের দিন রাতে আরো একজনকে জবাই করে হত্যা করা হয়। বিগত ১১ই জুলাই টিপু ও তৈয়ব গ্রুপের সংঘর্ষে খুন হয় তিনজন। উল্লেখ্য যে, এর ৪ মাস আগে তৈয়ব গ্রুপের হাতে টিপু গ্রুপের প্রধান টিপু নিহত হয়। কমার্স কলেজে ছাত্রলীগের আ জ ম নাসির গ্রুপ ও কাদের গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে খুন হয় আরো তিনজন। কানা বক্কর গ্রুপের হাতে নিহত হয় এম ই এস কলেজের জি এস কায়সার। পশ্চিম বাকলিয়া ডিসি রোডে চাঁদাবাজীর ঘটনায় দুই উপদলের কোন্দলে নিহত হয় শহীদ নামে অপর এক ক্যাডার। পলিটেকনিক এলাকায় ছেরা আকবার ও তাহের গ্রুপের সংঘর্ষে নিহত হয় দুইজন। ছেরা আকবর ও তাহের গ্রুপ/আ জ ম নাসির গ্রুপের আধিপত্য বিস্তার ও বদলা নেয়ায় ধারাবাহিক সংঘর্ষের সর্বশেষ শিকার ১২ই জুলাই ৮ জন ছাত্রলীগ ক্যাডার। চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের কোন্দলের কথার স্বীকৃতি ছাত্রলীগ নেতারাই দিয়েছে। গত ১৪ই জুলাইর 'যুগান্তর' পত্রিকার শেষ পাতায় "চট্টগ্রামে

www.pathagar.com

ছাত্রলীগের কোন্দল নিরসনে বৈঠক হচ্ছে" শীর্ষক প্রকাশিত খবরই তার প্রমাণ। এছাড়াও সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, তেজগাঁও পলিটেকনিক, শেরপুর জিলার নালীতাবাড়ী, শরীয়তপুর, কুমিল্লা, নড়াইলসহ সারাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্রলীগের শুধুমাত্র দলীয় কোন্দলেই খুন হয়েছে আরো অর্ধশতাধিক।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুগণ,

চট্টগ্রামের ৮ ক্যাডার খুনের নিজেদের কেলেংকারী অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য জঘন্য ষড়যন্ত্র করা হয়েছে এবং একশ্রেণীর সংবাদপত্র জামায়াত ও শিবিরের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর প্রচারণা চালাচ্ছে। হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন মহলকে দায়ী করা ন্যায় নীতির পরিপন্থী। আওয়ামী লীগের দলীয় ক্যাডার চট্টগ্রামের পুলিশ কমিশনারের বিবৃতিকে ভিত্তি করে রেডিও টেলিভিশনে এবং পত্র পত্রিকায় শিবিরের উপর দায় দায়িত্ব চাপিয়ে যে জঘন্য ও আপত্তিকর প্রচারণা চালানো হচ্ছে আমরা তার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানাচ্ছি। জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিরুদ্ধে সরকারীদলের এই দায়িত্বহীন ও কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত আচরণের ফলে ইতিমধ্যেই বরিশাল, বাগেরহাট, নারায়ণগঞ্জ, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, পাবনা, গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সরকারী দল কর্তৃক সশস্ত্র হামলা, সন্ত্রাস, ভাংচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। পাবনায় জামায়াতের অন্যতম কেন্দ্রীয় নেতা সাবেক সংসদীয় দলের ডেপুটি লিডার ও প্রবীণ পার্লামেন্টারিয়ান মাওলানা আব্দুস সুবহানের বাড়িতে হামলা চালিয়ে তার একটি গাড়ী ভাংচুর ও বাড়ির ক্ষতি সাধন করা হয়। বরিশাল শহর জামায়াতের আমীর এডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসাইন হেলালের বাড়ি ও তার আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে হামলা চালিয়েও লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। ছাত্রলীগের নেতা অজয় কর জামায়াত শিবিরকে নিশ্চিহ্ন করার ঘোষণা দিয়ে উস্কানীমূলক ও উত্তেজনাকর বক্তব্য দিয়েছে। এমনকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্বহীন উক্তি করেছেন। ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক এই ধরনের ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ করার আহ্বান জানাচ্ছি। সরকারী প্রশাসন যে সন্ত্রাসীদের হাতে বন্দী তার বড় প্রমাণ সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তার দলের অঙ্গ সংগঠনের কতিপয় নেতাকে গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান। এখনও পর্যন্ত তাদের কাউকেই গ্রেফতার করা হয়নি। চট্টগ্রামেও প্রকৃত অপরাধীদের পরিবর্তে নিরীহ লোকদের পুলিশ অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করেছে। চট্টগ্রামের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারাদেশে পুলিশের চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি ও পক্ষপাতিত্ব জনগণকে হতবাক করেছে। আন্দরকিল্লাস্থ মদীনা কম্পিউটারের মালিক জামায়াত কর্মী মাহমুদুর রহমানকে দোকান থেকে টেনে হেচড়ে বের করে পুলিশের সামনেই লাঠি ও ছুরির আঘাতে রক্তাক্ত মুমূর্ষ অবস্থায় ফেলে যায়। তিনি পরদিন সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেন। পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেনি। উপরন্তু চট্টগ্রামে তার জানাজা অনুষ্ঠানে বাধা দিয়ে লাশ ছিনিয়ে নিয়ে গ্রামের বাড়ি পাঠায়। খুনীদের রক্ষা করার জন্যই পুলিশ একাজ করেছে। আমরা মনে করি সরকারের মদদ ও পুলিশের যোগসাজশেই সারাদেশে হত্যা, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, রাহাজানী ও নানাবিধ অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

সরকার ও তার দোসররা যদি মনে করে থাকেন তাদের অপকর্মের দায়িত্ব জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর চাপিয়ে নিজেদের ব্যর্থতা এবং দলীয় কোন্দল ধামাচাপা দিতে সক্ষম হবেন তাহলে তারা ভুল করছেন। অতীতেও এই মহলটি বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে জামায়াত ও শিবিরের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়েছেন ও উস্কানী দিয়েছেন। খুলনায় রতন সেন হত্যার পর, ৯২ সালে রাশেদ খান মেনন ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হবার ঘটনায়, ৯৯ সালে জাসদ নেতা কাজী আরেফ হত্যাকাণ্ডের পর এবং '৯৯ সালেই উদীচির অনুষ্ঠানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনার দায়-দায়িত্ব জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর চাপিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে মিথ্যা প্রচারণার অভিযান চালানো হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এ সবই মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে যারা রাজনীতি করে এবং নিজেরা ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে যারা অন্যের উপর দোষ চাপায়, নিজ দলের লোকদেরই হত্যা করে যারা উল্লাস করে, তাদের পক্ষে সবই সম্ভব। তবে আমরা মনে করি দেশবাসী এদেরকে চিনে এবং এদের সম্পর্কে সজাগ। চট্টগ্রামে ৮ খুনের সাম্প্রতিক ঘটনার দায়-দায়িত্ব শিবিরের উপর চাপিয়ে যে মিথ্যাচার করা হচ্ছে আগের ঘটনাগুলোর মত এসব মিথ্যা প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ। তাই আমরা পুনরায় ১২ জুলাই সংঘটিত বর্বর হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করছি। এই সাথে সরকারীদলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি মিথ্যা ও উস্কানীমূলক প্রচারণা বন্ধ করুন। কারণ এটা সরকারের জন্য কোন কল্যাণ বয়ে আনবেনা। ছাত্র রাজনীতিকে সন্ত্রাস মুক্ত করার অঙ্গীকার করেছিলেন আপনারা ক্ষমতায় যাওয়ার আগে। অথচ আজ সরকারে গিয়ে আপনারাই সন্ত্রাস লালন করছেন এবং চাঁদাবাজ, মাস্তান, টেণ্ডারবাজ ও সন্ত্রাসীদের গডফাদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এজন্য জনগণের নিকট জবাবদিহী করতে হবে। সরকারী দলের ক্ষমতা আকড়ে থাকা ও ছাত্রদের রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহারের কৌশল দেশকে এক ভয়ংকর সংকটের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। অস্ত্র, ক্যাডার বাহিনীর হাত থেকে শিক্ষাংগনকে উদ্ধার না করা গেলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলই যদি অস্ত্র ও ক্যাডার রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা ও মদদদাতার ভূমিকায় থাকে তাহলে পরিস্থিতির উন্নতির কোন সম্ভাবনা নেই। আমরা সুস্থ ও গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। সরকারী দলসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহবান জাতির বৃহত্তর স্বার্থে ছাত্রদের মধ্যেও শিক্ষাংগণে অস্ত্রের ঝনঝনানি বন্ধ করুন। দলীয় স্বার্থে ছাত্রদের ব্যবহার বন্ধ করুন। এই সাথে আমি সাংবাদিক বন্ধুদের আবেদন জানাবো কারো হুমকীতে ভীত না হয়ে আপনারা যা সত্য তাই প্রকাশ করুন। উস্কানীমূলক ও ভিত্তিহীন খবর পরিবেশন করে জাতিকে প্রতারিত করার অধিকার কারো নেই। কেউ দাবি করলেই অভিযোগ সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। তাই বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশন এবং উভয় পক্ষের মতামতের প্রতিফলন ঘটানো সংবাদপত্রের এক বিরাট দায়িত্ব। অতীতেও সত্য প্রকাশে সংবাদপত্র সাহসী ভূমিকা পালন করেছে এবং জালেমের বিরুদ্ধে ও মজলুমের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত ভূমিকা পালন করেছে। পরিশেষে

www.pathagar.com

দেশবাসীর প্রতি আমাদের আবেদন মিথ্যা প্রপাগাণ্ডায় আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। সত্যের জয় অবশ্যাম্ভাবী। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করছি। খোদা হাফেজ ॥

জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের প্রতিবাদ

ঢাকা, ১৫ই জুলাই, ২০০০ ইং

"চট্টগ্রাম মহানগরের বহদ্দারহাটে গত ১২ই জুলাই আটজনের নৃশংস হত্যাকান্ডের জন্য কারা দায়ী তা তদন্ত করে নির্ণয় করা ছাড়াই ছাত্রলীগ শিবিরকে দোষী বলে মিথ্যা দাবী করার সাথে সাথে সারা শহরে ব্যাপক ধরপাকর শুরু হয়।

এ ঘটনার পূর্বদিনই ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগের দু' গ্রুপের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়। পরদিন এরই প্রতিক্রিয়ায় মাইক্রোবাসে হামলা হয়েছে বলে স্বাভাবিকভাবেই জনগণের ধারণা। সম্প্রতি শিবিরের সাথে ছাত্রলীগের এমন কোন বিরোধের ঘটনা চট্টগ্রামে ঘটেনি যাতে এ হত্যাকান্ডের জন্য শিবিরকে দায়ী বলে সন্দেহ করা যায়।

সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় যে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিনা প্রমাণে জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে তাদের স্বভাবজাত আক্রমণাত্মক ভাষায় হুমকি দেয়া কর্তব্য মনে করলেন।

আমরা এই নৃশংস হত্যাকান্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবি করছি এবং তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের পূর্বে জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে বিষোদগার বন্ধ করার জোর দাবি জানাই।

দেশবাসীর নিকট এ কথা সুস্পষ্ট যে সম্মিলিত বিরোধী দলের আন্দোলনের একটি শরীক দলকে নির্যাতন করার মহাসুযোগ হিসাবেই সরকার এ সন্ত্রাসী ভূমিকা অবলম্বন করেছেন। এ উস্কানীর ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে সরকারের সন্ত্রাসী ক্যাডাররা জামায়াত অফিস, জামায়াত নেতাদের বাড়ি ও দোকানে হামলা চালিয়েছে এবং জামায়াতের লোকদের উপরও আক্রমণ চালিয়েছে। এভাবে আইনের পরওয়া না করে যারা যুলুম চালাচ্ছে তাদেরকে বিরত করার দায়িত্ববোধও সরকারের আছে বলে মনে হয় না।

আমরা নিশ্চিত যে শীগ্‌গীরই এ কথা প্রমাণিত হবে যে, জামায়াত-শিবির ঐ হত্যাকান্ডের সাথে মোটেই জড়িত নয়।

পূর্বে বারবার এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে কোথাও রাজনৈতিক হত্যার ঘটনা ঘটলেই এটাকে অজুহাত বানিয়ে জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে বিষোদগার করা হয়। যেমন খুলনায় রতন সেন ও কুষ্টিয়ার কাজী আরেফ হত্যা, ঢাকায় রাশেদ খান মেননের উপর গুলিবর্ষণ এবং যশোহরের উদিচীর মঞ্চে বোমা হামলা।

এর কোনটাতেই জামায়াত-শিবিরকে দোষী প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। চট্টগ্রামের ঘটনায়ও ইনশাআল্লাহ জামায়াত-শিবির নির্দোষ প্রমাণিত হবে।

কিন্তু ইতিমধ্যে জামায়াত-শিবিরের উপর যে যুলুম নির্যাতন চালানো হচ্ছে এর কোন প্রতিকার কি কখনো সম্ভব হবে?

আমরা এ সরকারী সন্ত্রাসের তীব্র প্রতিবাদ জানাই এবং সচেতন দেশবাসীর বিবেকের নিকট বিবেচনার আহ্বান জানাই।" দৈনিক সংগ্রাম ১৬/৭/২০০০

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর আমীর অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ আবু তাহের গত ১৩ই জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন

সম্মানিত সাংবাদিক বন্ধুরা,

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আপনারা এখানে উপস্থিত হবার জন্য আপনাদের জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। আপনারা জানেন গত কাল প্রকাশ্য দিবালোকে বহদ্দারহাটে সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে আট ব্যক্তি নির্মমভাবে নিহত হয়। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই এবং সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে শাস্তিদানের জোর দাবি জানাই। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ও অযৌক্তিকভাবে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ এবং ইসলামী ছাত্র শিবির এর উপর দোষ চাপিয়ে সরকারীদল এবং সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকরা জঘন্য অপপ্রচার চালাচ্ছে। পুলিশ নিরীহ ছাত্র-জনতাকে গ্রেফতার ও ঘরে ঘরে তল্লাশী করছে, সন্ত্রাসীরা দোকান পাট ভাংচুর ও লুট করছে, রাস্তায় নিরীহ মানুষের উপর আক্রমন ও হামলার জঘন্যতম তান্ডবলীলায় মেতে উঠেছে। পুলিশ সম্পুর্ণ অন্যায়ভাবে বিভিন্ন বাসা, বাড়ী, মেস ও রাস্তাঘাট থেকে কয়েকজন শিবির কর্মীসহ প্রায় ২৫/৩০ জন নিরীহ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে। গতকাল দুপুরে আন্দরকিল্লাস্থ আসফাতাহ শপিং সেন্টারের মদিনা কম্পিউটারের মালিক জামায়াত কর্মী মাহমুদুর রহমানকে সরকারী দলের সন্ত্রাসীরা তার দোকান থেকে টেনে হেচড়ে বের করে দিনে দুপুরে পুলিশের সামনে নির্মমভাবে লাঠি ও ছুরির উপর্যুপরি আঘাতে রক্তাক্ত করে মুর্মুষ অবস্থায় রাস্তায় ফেলে যায়। তিনি আজ সকালে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শাহাদাত বরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহি.... রাজিউন)। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় পুলিশের সামনেই মাহমুদুর রহমান নির্মমভাবে আহত হলেও পুলিশ আওয়ামী সন্ত্রাসীদের কাউকে গ্রেফতার তো করেইনি বরং জানাযা ছাড়াই তাকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছে। মাহমুদুর রহমানের হত্যাকারীদের রক্ষা করার হীন ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই পুলিশ এই কাজ করেছে।

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর সারা দেশে চুরি-ডাকাতি, খুন-ধর্ষণ, হত্যা-সন্ত্রাস রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। সরকারী দলের কারো কারো ছত্রছায়ায় চট্টগ্রামের অগ্রাবাদ, নাসিরাবাদ রোডসহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য হত্যা-সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজীর ঘটনা চট্টগ্রামের কারো অজানা নয়। সরকারী দলের কয়েকজন নেতার আধিপত্য বিস্তারের লালসা এবং অন্তর্কোন্দলের কারণে বহু তাজা প্রান ঝরে পড়েছে অকালে। গতপরশু তাদেরই পারস্পরিক সংঘর্ষে ফটিকছড়িতে তিন জন তরুণ প্রাণ হারিয়েছে। গত কালের ঘটনাও সে ধরনের কোন্দলের জের কিনা তা খতিয়ে দেখা দরকার। সরকারী দলের ছত্রছায়া ছাড়া প্রকাশ্য দিবালোকে এ ধরনের বর্বরতম হামলা চালানোর সাহস অন্য কারো থাকাটা স্বাভাবিক নয়।

www.pathagar.com

তাছাড়া বহদ্দারহাট পুলিশ বক্স থেকেও মাত্র কয়েক গজ দূরে ঘটনা ঘটিয়ে সন্ত্রাসীরা নির্বিঘ্নে সড়ে পড়লে পুলিশ তাদের গ্রেফতার তো দূরের কথা পিছু ধাওয়াও করলো না কেন। এরই বা রহস্য কি?

সাংবাদিক বন্ধুগণ,

আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই যে, জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ ও ইসলামী ছাত্রশিবির আদর্শের রাজনীতি করে। আমরা মনে করি হত্যা ও সন্ত্রাস কেবল নৈরাজ্যই ডেকে আনতে পারে। এ গর্হিত পথে কোন আদর্শ কায়েম করা সম্ভব নয়। বিরোধীদলের আন্দোলনে বেসামাল হয়ে বিরোধী দলের অন্যতম শক্তি জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠছে সরকার। তাই তাদেরই সৃষ্ট এ জঘন্য হত্যাকান্ডের দায়-দায়িত্ব অন্যায় ও অযৌক্তিকভাবে, অন্যদের উপর চাপিয়ে দিয়ে বিরোধী দলের আন্দোলনকে দুর্বল করতে চায়। আমরাও এ জঘণ্য অপতৎপরতার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। শহীদ মাহমুদুর রহমানের খুলীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। শিবির কর্মীসহ অন্যায়ভাবে গ্রেফতারকৃত নিরীহ ব্যক্তিদের মুক্তি দাবি করছি। পুলিশের পক্ষপাতদৃস্ট ভূমিকা পরিহার করে সুস্থ গণতান্ত্রিক ধারার রাজনীতি চর্চা করার জন্য সরকারীদলসহ সংশ্লিষ্ট দলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিবাদ

ঢাকা, ১৩ জুলাই

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় কার্যকরী পরিষদের ঢাকায় অবস্থানরত সদস্যদের এক জরুরী বৈঠক আজ কেন্দ্রীয় সভাপতি এহসানুল মাহবুব জুবায়েরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আজ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে চট্টগ্রাম মহানগরীতে সংঘটিত ঘটনার সাথে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে যে সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় ঃ

ইসলামী ছাত্রশিবির সৎ, যোগ্য ও চরিত্রবান ছাত্রদের একটি সংগঠন। বিরোধিতার মোকাবেলা শিবির তার আদর্শ এবং রাজনীতি দিয়েই করে থাকে। কোন ধরণের হত্যা ও সন্ত্রাসের রাজনীতি ইসলামী ছাত্রশিবিরের বৈশিষ্ট্য নয়। আজ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে চট্টগ্রামে সংঘটিত ছাত্রলীগের কথিত হত্যাকান্ডের সাথে ইসলামী ছাত্রশিবিরের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই। এই ঘটনা ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলেরই ফল। বিগত কয়েক মাসে চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের হাতে তাদের একাধিক নেতা-কর্মী খুন হয়েছে। জাতীয় পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে জাতির কাছে যা পরিষ্কার রয়েছে। ১২ জুলাইয়ের হত্যাকান্ডের পূর্ব দিনও ফটিকছড়িতে তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে তিনজন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী খুন হয়েছিল। চট্টগ্রাম পলিটেকনিক কলেজের ছাত্রসংদ নর্বাচনে আ. জ. ম. নাসির গ্রুপের তান্ডবের কারণে ছেড়া আকবর গ্রুপ প্যানেল জমা দিতে

www.pathagar.com

পারেনি। চট্টগ্রাম পলিটেকনিক কলেজে দুই গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব থেকেই এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে। শুধু চট্টগ্রামেই নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এমনকি চট্টগ্রামে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতেও ছাত্রলীগের সংঘর্ষে তাদের কর্মী খুন হওয়ার নজির রয়েছে। ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে সামনে রাখলে সচেতন মহলের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সাম্প্রতিক হত্যাতান্ড ও তাদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের নগ্ন এবং নির্মম বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাত্রশিবিরকে জড়িয়ে প্রকাশিত সংবাদ ভিত্তিহীন, উদ্দেশ্যপূর্ণ এবং বানোয়াট। ইসলামী ছাত্রশিবিরের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করা এবং ছাত্রলীগের কর্মীদের উস্কে দিয়ে সারাদেশে সংঘাত, সংঘর্ষকে ছড়িয়ে দেয়ার হীন মানসেই এহেন সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছে। বিরোধী দলকে দমন এবং ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল থেকে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহের চেষ্টা করা হচ্ছে। কোনরূপ প্রমাণ ছাড়াই শিবিরকে জড়িয়ে সংবাদ পরিবেশনের উদ্দেশ্য একটাই, আর তা হলো দেশের পরিস্থিতিকে অস্থিতিশীল করে তোলা। এর পেছনে দেশদ্রোহী মহলের হাত রয়েছে। শিবিরের পরিষদ হলুদ সাংবাদিকতা থেকে বিরত থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট পত্রিকাগুলোর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

পরিষদ ঘটনাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের তান্ডবতার তীব্র নিন্দা জানায়। গতকাল বিকালে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সীমান্ত তালুকদারের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একদল উচ্ছৃংখল নেতা-কর্মী আন্দর কিল্লাতে ব্যাপক দোকানপাটে হামলা চালায় ও লুটপাট করে। তাদের বর্বর হামলায় ২৫ জনেরও অধিক শিবির কর্মীসহ নীরিহ জনগণ মারাত্মক আহত হয়। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আহত জামায়াত কর্মী মাহমুদুর রহমান আজ শাহাদাত বরণ করেছেন। তাকে আন্দর কিল্লাতে অবস্থিত তার দোকান থেকে অপহরণ করে আ. জ. ম. নাসিরের বাড়ীতে নিয়ে পৈশাচিক নির্যাতন করা হয়। পুলিশ প্রশাসন দায়িত্বশীল আচরণের পরিবর্তে আওয়ামী লীগের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে। অন্যায়ভাবে নীরিহ শিবির কর্মীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। গতকাল চট্টগ্রাম কলেজে পরীক্ষার্থী শিবির কর্মীদেরকে পরীক্ষার আগের দিন গ্রেফতার প্রমাণ করে সরকার প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার জন্য ছাত্রলীগের ঘরের কোন্দলকে শিবিরের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে, আর এর মাধ্যমে সরকার ছাত্রলীগের সন্ত্রাসী ভূমিকাতেই ইন্ধন যোগাচ্ছে। চট্টগ্রাম কলেজের অধ্যক্ষও বলেছেন, "প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করার জন্য পরীক্ষার আগের দিন আমার ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয়েছে।" আওয়ামী লীগের উচিত নিজেদের ঘর সামলানোর জন্য দলের চিহ্নিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করা। শিবিরের পরিষদ সরকার ও প্রশাসনকে দায়িত্বশীল আচরণ করার আহ্বান জানায় এবং বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করার মাধ্যমে প্রকৃত সন্ত্রাসীদের চিহ্নিত করে তাদের গ্রেফতারও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানায়।

দৈনিক সংগ্রাম- ১৪/৭/২০০

www.pathagar.com

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য-বিবৃতি

বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বিবৃতি

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বিএনপি চেয়ারপার্সন ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা নিয়া গতকাল এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম হত্যাকান্ডের বিচার বিভাগীয় তদন্ত, প্রকৃত অপরাধীদের বিচার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান এবং এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারের দমন-নিপীড়ন বন্ধের দাবী জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে বেগম জিয়া বলেন, গত ১২ জুলাই চট্টগ্রামে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড একটি বর্বর ও অমানবিক ঘটনা। এই ঘটনা প্রমাণ করে সারাদেশে আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির শোচনীয় অবনতি ঘটেছে। সারাদেশ আজ হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের তাণ্ডবলীলায় জর্জরিত। মানুষের জানমালের ন্যূনতম কোন নিরাপত্তা নেই। এই সরকার সন্ত্রাস নির্মূল করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। সন্ত্রাস বন্ধ, সন্ত্রাসীদের হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে সরকারের এই ব্যর্থতায় দেশবাসী আজ চরম নিরাপত্তাহীন অবস্থায় আছে। পুলিশসহ প্রশাসন দলীয়করণ, পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে না দেয়া, প্রকৃত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও বিচার না করা এবং সরকারের রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সন্ত্রাসের কারণে সারাদেশে সন্ত্রাস আজ মহামারীর আকার ধারণ করেছে।

বিবৃতিতে বেগম জিয়া বলেন চট্টগ্রামের এই নির্মম হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেশবাসীর কাম্য। কিন্তু এই হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে বিরোধীদলের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের নির্বিচারে দমন-নিপীড়ন কারো কাম্য নয়। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সরকার এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের ষড়যন্ত্র করছে। সরকার এবং ক্ষমতাসীন দল দেশের বিভিন্ন স্থানে উস্কানীমুলক বক্তব্য দিয়ে এবং তৎপরতা চালিয়ে সারাদেশকে সংঘাতের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। এটা দেশ ও জনগণের জন্য মোটেই শুভ নয়।

বিবৃতিতে তিনি চট্টগ্রামের ঘটনা তদন্তের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি প্রদান এবং রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য উক্ত ঘটনাকে ব্যবহার করে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের হয়রানি না করার জন্য সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আহ্বান জানান।

ইনকিলাব ১৯/৭/২০০০

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদের বিবৃতি

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান সাবেক প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ চট্টগ্রামে ৮ খুনের ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানিয়ে বলেছেন, দিবালোকে প্রকাশ্যে চট্টগ্রামে যে নারকীয় হত্যাকান্ড ঘটেছে তাতে গোটা দেশবাসী স্তম্ভিত হয়েছে। চট্টগ্রামে ছাত্র হত্যা এবং যশোরে সাংবাদিক হত্যাসহ সারাদেশে যেভাবে খুন-সন্ত্রাস চলছে তাতে আমি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। চট্টগ্রামের ঘটনায় একটি বিরোধী দলের ওপর সরকারের দমনমূলক

www.pathagar.com

কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানিয়ে তিনি বলেন, এই হত্যাকাণ্ড কারা ঘটিয়েছে সে সম্পর্কে পুলিশের রিপোর্ট ব্যতীত শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে রাজনৈতিক প্রতিহিংসাবশত জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে দমনপীড়ন চালানো হচ্ছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট বলেন, চারদলীয় বিরোধী জোটকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যেই সরকার পরিকল্পিতভাবে এভাবে দমনমূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে।

জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ এক বিবৃতিতে বলেন, চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক এটা আমি একান্তভাবে প্রত্যাশা করি। সেইসব দোষীদের সনাক্ত করার জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত হোক। কিন্তু প্রকৃত খুনীদের ধরার কোন উদ্যোগ না নিয়ে সারাদেশে জামায়াতে ইসলামীর নেতা-কর্মীদের হয়রানি এবং তল্লাশির নামে তাদের অফিস ভাংচুরের মতো প্রতিহিংসামূলক অপকর্মকাণ্ড চালানো হচ্ছে। এহেন তৎপরতার আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাই।

তিনি বলেন চট্টগ্রাম হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত খুনীদের আড়াল করে কিংবা সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়ে সরকার একটি বিরোধী দলের ওপর দোষ চাপিয়ে ঘটনা অন্যদিকে প্রবাহিত করতে চাচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি দলকে দায়ী করে যে বক্তব্য দিয়েছেন তা উদ্বেগজনক। কারণ এটা বিচার ব্যবস্থাকে সরাসরি প্রভাবিত করার সামিল।

বিবৃতিতে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ, চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত দোষীদের গ্রেফতার করে অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন এবং জামায়াতে ইসলামী ও তার অঙ্গ সংগঠনের বিরুদ্ধে দমনপীড়ন বন্ধ করার আহ্বান জানান। প্রেস বিজ্ঞপ্তি।
সংগ্রাম ২০/৭/২০০০

লিয়াজোঁ কমিটির বিবৃতি

ঢাকা, ১৩ই জুলাই, ২০০০

গতকাল চট্টগ্রামে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের দলীয় কোন্দলের শিকার হয়ে প্রকাশ্যে দিবালোকে ব্রাশফায়ারে ৮ জন নিহত হবার ঘটনার নিন্দা এবং সুপরিকল্পিতভাবে উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে মানুষের দৃষ্টি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার জঘণ্য ষড়যন্ত্রের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে চার দল বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোটের লিয়াজোঁ কমিটির পক্ষ থেকে আজ বৃহস্পতিবার এক বিবৃতি প্রদান করা হয়।

ছাত্রলীগের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ের জের হিসেবে সংঘটিত ঘটনার দায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের উপর চাপিয়ে দিয়ে ক্ষমতাসীন দল আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা ঢাকা দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত।

চার দলীয় লিয়াজোঁ কমিটি উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেদের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে উত্তেজনা ছড়ানোর মাধ্যমে ঘটনা প্রবাহকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার এই জঘণ্য ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে। বিবৃতিতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে সশস্ত্র ছাত্রলীগ ক্যাডারদের তান্ডব, ব্যাপক ভাংচুর, পুলিশের নীরব ভূমিকা এবং তল্লাসীর নামে অন্যায়ভাবে বিরোধী দলীয় ৩০ জন ছাত্রনেতা ও কর্মীকে গ্রেফতারেরও তীব্র প্রতিবাদ

www.pathagar.com

জানানো হয়। বহদ্দারহাট পুলিশ ক্যাম্পের মাত্র আড়াইশ গজের মধ্যে সংঘটিত ছাত্র লীগের একটি বিশেষ গ্রুপের উপর তাদেরই অপর একটি গ্রুপের প্রকাশ্য দিবালোকে হামলার এই ঘটনাকে যতই ধামাচাপা দেবার চেষ্টা করা হোক না কেন নিরপেক্ষ তদন্ত চালালে পুলিশের রহস্যজনক ভূমিকা ও সত্য ঘটনা বের হয়ে আসবে বলে লিয়াজোঁ কমিটি নিশ্চিত। বিবৃতিতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্র দল ও ছাত্র শিবিরের নেতৃবৃন্দকে দায়ী করে মিথ্যা মামলা দায়েরেরও তীব্র নিন্দা জানানো হয়। একথা আজ সবার কাছে সুস্পষ্ট যে, ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের আভ্যন্তরীণ কোন্দলে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে খুন খারাপীর ঘটনা ঘটছে এবং সরকার সন্ত্রাসীদের মদদ দেয়ায় দেশে আইন শৃংখলা বলতে কিছু নেই।

চার দলীয় লিয়াজোঁ কমিটি অবিলম্বে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করে এবং গ্রেফতারকৃতদের মুক্তি দিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি দাবী করে। লিয়াজোঁ কমিটি সরকারী ছাত্র সংগঠনের দলীয় কোন্দলের জের হিসেবে সংঘটিত ঘটনার দায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর চাপিয়ে উত্তেজনা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং জনগণের জানমালের ক্ষতি সাধন থেকে বিরত থাকার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানায়।

৭ দলীয় জোটও অনুরূপ এক বিবৃতিতে নিজেদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল চাপা দিয়ে জনগণের দৃষ্টি সরানোর জন্য ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার আওয়ামী অপকৌশলের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে। সংগ্রাম ১৪/৭/২০০

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান শাইখুল হাদীস মাওলানা আজীজুল হকের বিবৃতি

ইসলামী ঐক্যজোট চেয়ারম্যান ও বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের আমীর শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক বলেছেন, অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার নামে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই আইন-শৃংখলা ধ্বংসের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছেন। তিনি বলেন, অব্যাহতভাবে প্রচলিত আইনের বিরুদ্ধে যেভাবে ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন তাতে দেশ ও জাতি শংকিত হয়ে পড়েছে। শায়খুল হাদীস গতকাল এক বিবৃতিতে বলেন, আইনকে তার স্বাভাবিক গতিতে এগুতে দিতে হবে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সে গতিতে হস্তক্ষেপ করে তাতে বিঘ্নের সৃষ্টি করছেন। চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ কি শাড়ি-চুড়ি পরে বসে আছে, পুলিশ এবং প্রশাসনে স্বৈরাচার, বিএনপি ও স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতকদের প্রেতাত্মারা বসে আছে, আইন নিজস্ব গতিতে না চললে আপনাদের তা দেখতে হবে, অপরাধীদের ধরতে দুচারটা লাশ পড়লেও কোনো অপরাধ হবে না। আপনারা ব্যর্থ হলে দল অস্ত্র হাতে নেবে ইত্যাদি উস্কানীমূলক বক্তৃতা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী যেমন দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন, তেমনি জাতিকে সর্বনাশা বিভক্তির পথেও পরিচালিত করছেন। যিনি হানাহানি, বিশৃংখলা ও সন্ত্রাস দমনে অগ্রণী ভূমিকা পালনে তৎপর হবেন তিনি যদি এ ধরনের উস্কানীমূলক ও বিভেদ সৃষ্টিকারী কথা বার বার উচ্চারণ করতে থাকেন তাহলে দেশ কিভাবে ঐক্যবদ্ধ ও সন্ত্রাসমুক্ত হবে। শায়খুল হাদীস বলেন, ৯ দিন অতিবাহিত হবার পরও বহদ্দারহাট হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতার না করা যেমন উদ্বেগজনক, তেমনি সেটা প্রশাসনিক দুর্বলতাও। এ জন্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ

www.pathagar.com

শিখরে আরোহণকারীকে সেই দুর্বলতার দায়ভার বহন করতে হবে। বিরোধী দলের উপর পাইকারী হারে দমন, পীড়ন ও গ্রেফতারী অভিযান চালানোর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, বহদ্দারহাট হত্যাকান্ডের সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের নিমিত্তে অবিলম্বে বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করুন। আইনকে বাধাগ্রস্ত করবেন না। তা হলে এদেশের মানুষ সরকারের জুলুম ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।

দিনকাল- ২১.৭.২০০০

নিজ ব্যর্থতা লুকানোর জন্যই সরকার জামায়াতকে দায়ী করছে

সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক

রায়হান রবিউল্লাহ

"সন্ত্রাস দমনে সরকারের ব্যর্থতা লুকানোর জন্য সরকার বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডে জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করেছে"- কথাগুলো বললেন দেশের বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, খ্যাতিমান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক। সরকারের দুর্নীতি, আওয়ামী নেতা ও মন্ত্রীদের সন্তান-সন্তানাদির মাধ্যমে সন্ত্রাস সৃষ্টি এবং সন্ত্রাস দমনে সরকারের ব্যর্থতা, সংসদকে অকার্যকর করে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা, রেডিও-টেলিভিশনকে স্বায়ত্বশাসনের পরিবর্তে দলীয়করণ, বিপর্যস্ত অর্থনীতি, তাঁবেদারী পররাষ্ট্রনীতি এবং বিরোধী দলের সাথে স্বৈরাচারী আচরণ সর্বোপরি বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে ইনকিলাবের এই প্রতিনিধির সাথে আলোচনায় মুখোমুখি হন এই রাজনীতিবিদ। কথা বলছেন, কিভাবে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে, সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন করে সুখী, সমৃদ্ধশালী, শ্রমমণ্ডিত দেশ ও জাতি গঠন করা যায়।

ইনকিলাব : চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ড, কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনার সভাস্থলে বোমা উদ্ধার সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর পরই সরকারের পক্ষ থেকে জামায়াত-শিবির ও বিরোধী জোটকে অভিযুক্ত করা হচ্ছে এ সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক : দেশে সম্প্রতি বিভিন্ন হত্যাকাণ্ডের জন্য ঢালাওভাবে সরকার যে জামাত-শিবিরকে দায়ী করে যাচ্ছে তা কিন্তু অবান্তর। আগে বিচার বিভাগীয় কমিটি গঠন করে তদন্ত করে হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত সহস্য উদঘাটন করে তারপর বলতে হবে কে দোষী? কিন্তু সরকার তা না করে একপেশেভাবে জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করে বিরোধী আন্দোলনকে নস্যাৎসহ দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করার চেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে সাংবাদিক শামছুর রহমানকে যারা হত্যা করেছে তারা আন্তর্জাতিক চোরাচালান সদস্য এমনটি আভাস পাওয়া গেছে সিআইডি'র পক্ষ থেকে যা পরবর্তীতে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয় অথচ সরকারী মহল ও বুদ্ধিজীবী মহল থেকে কিন্তু জামায়াত-শিবিরকে প্রথম অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

দৈনিক ইনকিলাব- ১১/৮/২০০০

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবী, আইনজীবী, শিক্ষক ও ওলামা মাশায়েখদের বিবৃতি

চট্টগ্রামে ৮ জনের হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে ১১৮ জন বিশিষ্ট আইনজীবী এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাদের বক্তব্যের দায় বহন করতে হবে

চট্টগ্রামের বহদ্দার হাটের ৮ ব্যক্তির প্রকৃত হত্যাকারীদের খুঁজে বের করার দাবী জানিয়ে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী এডভোকেট খন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ, সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক স্পীকার এডভোকেট শেখ রাজ্জাক আলী এমপি, এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসাইন, সাবেক মন্ত্রী এডভোকেট মাহবুবুর রহমান এমপি, ব্যারিস্টার আসাদুজ্জামান, সাবেক মন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার এমপি, এডভোকেট আবদুর রব চৌধুরী, ব্যারিস্টার জিয়াউর রহমান খান এমপি, ব্যারিস্টার রফিকুল ইসলাম মিয়া, এডভোকেট নওয়াব আলী, ব্যারিস্টার আমিনুল হক এমপি, এডভোকেট জয়নুল আবেদীন, ব্যারিস্টার কুরবান আলী, এডভোকেট কাজী ফিরোজ রশীদ, ব্যারিস্টার মাহবুবউদ্দিন খোকন, ব্যারিস্টার আবদুর রাজ্জাকসহ ১১৮ জন আইনজীবী নিম্নোক্ত যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন।

গত ১২ই জুলাই চট্টগ্রামে ৮ জনের নৃশংস হত্যাকান্ড দেশের আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির সার্বিক অবনতি এবং নাগরিকদের জানমাল রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার আর একটি প্রমাণ। ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের হিসেবে ৩ জন নিহত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে ৮ জনের পৈশাচিক হত্যাকান্ডটির পেছনে কাদের হাত রয়েছে, সম্ভবত তা বুঝতে কারো বাকি নেই। মূল অপরাধীদেরকে খুঁজে বের করে তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করার জন্য আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী সংস্থার নিকট আমরা আহ্বান জানাচ্ছি।

এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি জাতিকে বিস্মিত করেছে। পুলিশের তদন্তের পূর্বেই তারা উভয়ে হত্যাকান্ডের জন্য শুধু জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করে ক্ষান্ত হয়নি, তারা জামায়াত-শিবির নেতা-কর্মীদেরকে নির্মূলেরও ডাক দিয়েছেন। ফলে পুলিশের মদদপুষ্ট ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ দেশব্যাপী জামায়াত-শিবিরের কার্যালয়ে হামলা চালাচ্ছে। তাদের আক্রমণে জামায়াত-শিবিরের বহু নেতা-কর্মী আহত হয়েছেন এবং অনেক মূল্যবান সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতিসাধিত হয়েছে। আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ দেশের অনেক স্থানে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। নির্দোষ লোকদের ভয় প্রদর্শন করা হচ্ছে। বরগুনার একজন সাবেক উপজেলা আমীরকে বর্বরের ন্যায় দিগম্বর করা হয়েছে। আমরা এ ধরনে বর্বর কার্যকলাপের নিন্দা করছি।

সংগ্রাম ২০/৭/২০০ ইং

www.pathagar.com

রাবির ১৬৯ জন শিক্ষকের বিবৃতি

দেশব্যাপী সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ

রাজশাহী অফিস ঃ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬৯ জন শিক্ষক গতকাল শনিবার এক যুক্ত বিবৃতিতে চট্টগ্রামের ৮ খুনের নৃশংস ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেশব্যাপী সন্ত্রাস ছড়িয়ে দিয়ে চরম অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাণ্ডজ্ঞানহীন নির্দেশ ও বেসামাল কথাবার্তার কারণে পরিস্থিতির ক্রমেই অবনতি হচ্ছে। তাঁরা ৮ খুনের বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী জানান।

চট্টগ্রামের ঘটনাকে নিষ্ঠুর ও হৃদয়বিদারক বলে উল্লেখ করেন, খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী করেন। পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়, পুলিশ অবস্থানের সন্নিকটে প্রকাশ্য দিবালোকে দীর্ঘ সময় গোলাগুলী করে এতো বড় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে খুনীরা পুলিশের চোখের সামনে দিয়ে কি করে পালিয়ে যায় সে প্রশ্ন জনমনে নাড়া দিয়েছে।

ঘটনার পর সামান্য বিলম্ব না করে কোন প্রমাণ ছাড়াই রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দোষী করে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তাদের দল ও অঙ্গ সংগঠনসমূহ, সরকারী প্রশাসন ও প্রচারযন্ত্রের উস্কানিমূলক বক্তৃতা, নির্দেশ ও অপপ্রচারের মাধ্যমে সারা দেশে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে চলেছে। এতে শান্তিপ্রিয় নাগরিকের বিবেক আর্তনাদ না করে পারে না। বিবৃতিতে বলা হয়, এই সকল উস্কানিমূলক অপপ্রচারের ফলে শাসক দলের উচ্ছৃংখল সশস্ত্র ক্যাডাররা বরিশাল, পাবনা, গাইবান্ধা, রাজশাহী, রংপুর, চট্টগ্রাম ও ঢাকাসহ দেশের সর্বত্র হামলা চালাচ্ছে। তারা মানুষকে দোকান থেকে টেনে হিঁচড়ে কুপিয়ে হত্যা, লাশের জানাযা পড়তে না দেয়া, দাড়িপাকা জামায়াত নেতাকে দিগম্বর করে রাস্তা রাস্তায় হাঁটানো এবং পৈশাচিক নির্যাতনের পর রাস্তায় ফেলে দেয়া, বাড়ী-ঘর দোকান-পাটে অগ্নিসংযোগ ও লুট করা, গাড়ী ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়া, পুলিশকে ব্যবহার করে ছাত্র-জনতাসহ ইচ্ছেমত গ্রেফতার ও নির্যাতন প্রভৃতি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে নিরীহ নাগরিকদের প্রতি অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। দেশের সর্বমহল থেকে যেখানে ঘটনার বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী উঠেছে সে সব উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাণ্ড জ্ঞানহীন কথাবার্তায় পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে বলে উল্লেখ করা হয়। শিক্ষকগণ দেশের আইন-শৃংখলা তথা শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে এই অরাজক পরিস্থিতির অবসান হওয়া আবশ্যক বলে উল্লেখ করে বিচার বিভাগের মাধ্যমে ঘটনার পূর্বাপর তদন্ত করে দোষী ব্যক্তিদের সনাক্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ইউসুফ আলী, সাবেক প্রোভিসি প্রফেসর আলতাফ হোসেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর আব্দুল হামিদ, রাঃ বিঃ কলা অনুষদের ডীন প্রফেসর মোখলেসুর রহমান। আইন অনুষদের ডীন ডঃ রবিউল হোসেন। রাবি শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর আব্দুল

www.pathagar.com

কাদির ভূঁইয়া, প্রফেসর কে এম শাহাদাত হোসেন মন্ডল, প্রফেসর নজরুল ইসলাম, প্রফেসর একে এম আজহারুল ইসলাম, প্রফেসর উমার আলী, প্রফেসর কোরবান আলী, প্রফেসর শাহ মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রফেসর রফিকুল ইসলাম ফারুকী, অধ্যাপক সোহরাব উদ্দীন আহমদ, প্রফেসর আজহার আলী, অধ্যাপক আব্বাস আলী, প্রফেসর দেলোয়ার হোসেন, প্রফেসর শামসুল আলম সরকার, প্রফেসর আবদুর রাজ্জাক, ডঃ জগলুল হায়দার, ডঃ এটিএম ওবায়দুল্লাহ, প্রফেসর সায়েদুল ইসলাম প্রমুখ।

দেশের ২৬ জন প্রখ্যাত আলেমের যুক্ত বিবৃতি

বিচার বিভাগ ও উকিলদের প্রতি অবমাননাকর উক্তি ও ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধের ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর অসংযত বক্তব্য, বিচার বিভাগ ও উকিলদের প্রতি অবমাননাকর উক্তি ও ধর্মীয় রাজনীতি বন্ধের ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে দেশের ২৬ জন প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরাম এক যুক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, চট্টগ্রামের হত্যাকান্ড ও কোটালী পাড়ার বোমা উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও শাসকদলের সন্ত্রাসীরা দেশব্যাপী ভয়ংকর তাণ্ডব সৃষ্টি করেছে। পুলিশ বহু নিরপরাধ লোককে গ্রেফতার করে অমানুষিক নির্যাতন করে তাদেরকে মিথ্যা মামলায় জড়াবার চেষ্টা করছে। এতিমখানা, মাদ্রাসা ও ইসলামী পাঠাগারসহ বহু প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ লুটপাট এবং ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। বহু আলেম, মুসল্লী, দাড়িওয়ালা ও টুপিওয়ালাদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে এবং পথেঘাটে দোকান ও বাড়ীতে তাদের উপর আক্রমণ করা হচ্ছে। সরকারের সর্বোচ্চমহল থেকে প্রতিদিন যে ভাষায় বক্তব্য ও বিবৃতি দেয়া হচ্ছে তা রীতিমতো উস্কানিমূলক ও উদ্বেগজনক : স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী অসংযত বক্তব্য প্রদান করে দেশের মধ্যে নৈরাজ্যময় অবস্থা সৃষ্টি করেছেন এবং সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছেন। যেমন "আর যদি একটি লাশ পড়ে তবে দশটি লাশ পড়বে। পুলিশ সন্ত্রাসীদের দমন করতে না পারলে আমার ছেলেরা অস্ত্র হাতে নেবে, কোর্ট হচ্ছে অপরাধীদের আশ্রয়স্থান, যেসব উকিল অপরাধীদের জন্য জামিন চায় এবং যেসব কোর্ট সন্ত্রাসীদের জামিন দেয় তাদের শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।"

বিবৃতিতে ওলামায়ে কেরাম বলেন, ইসলাম বিদ্বেষী, ভারতের দালাল, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের শত্রু কতিপয় সংগঠন ও সংস্থা তাদের চিরাচরিত স্বভাব অনুসারে দেশে ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করে দেয়ার জন্য মাঠে নেমেছে এবং হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ হিন্দুদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র দাবী করেছে। এদেশের উলামায়ে কেরামদের পক্ষ থেকে আমরা এসব দেশদ্রোহিতামূলক আচরণের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি। এসব স্বাধীনতা ও ইসলামের শত্রুদের ভূমিকার ব্যাপারে সরকারের নীরবতা দেশের জনগণকে উদ্বিগ্ন ও হতাশ করেছে।

www.pathagar.com

জাতির এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে দেশের উলামায়ে কেরামের পক্ষ থেকে তারা দেশের জনগণ ও সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে নিম্নোক্ত আহ্বান জানিয়েছেন, দেশের সরকার প্রধানকে সন্ত্রাসীদের নেতার মতো অসংযত ও উস্কানিমূলক বক্তব্য বন্ধ করে দেশের ১৩ কোটি জনতার সরকারের প্রধান হিসেবে দেশে শান্তি, সম্প্রীতি, সমৃদ্ধির ও দায়িত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করা। অবিলম্বে সরকারী দলের সন্ত্রাসীদের হামলা, লুটপাট বন্ধ করা হোক। সরকারের নীল নকশা অনুসারে পুলিশের হামলা, নির্যাতন ও মিথ্যা মামলা বন্ধ করা হোক। চট্টগ্রামের হত্যাকাণ্ড ও কোটালীপাড়ার বোমা উদ্ধারের বিষয় দু'টির জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে সত্য ঘটনা উদঘাটন করে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হোক। অন্যথায় দেশের জনগণ মনে করবে উক্ত ঘটনা সরকারের সাজানো নাটক। মসজিদ, মাদ্রাসা, এতিমখানা ও দ্বীনদার লোকদের ইতিমধ্যে যে ক্ষতি করা হয়েছে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হোক এবং যেসব দুর্বৃত্ত এসকল ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাথে জড়িত তাদেরকে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হোক। যারা শতকরা ৮৫ জন মুসলমানের দেশে ইসলামী রাজনীতি বন্ধ করার দাবী জানাচ্ছে তাদেরকে গ্রেফতার করে তাদের সকল রাজনৈতিক কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হোক। যারা বাংলাদেশের মধ্যে একটি হিন্দু রাষ্ট্র গঠন করার দাবী জানাচ্ছে তাদেরকে দেশদ্রোহী ঘোষণা দিয়ে তাদের সকল কার্যক্রম বন্ধ করে গ্রেফতার করে বিচার করা হোক। ইসলামের দুশমন, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের শত্রু ভারতের দালালদের বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে সকল বাংলাদেশী জনগণকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য উলামাদের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়।

স্বাক্ষরকারী উলামায়ে কেরাম হলেন ঃ মাওলানা আবুল কালাম মুহাম্মদ ইউসুফ, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী (এমপি), মাওলানা আবদুস সুবহান, মাওলানা কামাল উদ্দিন জাফরী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মাওলানা যায়নুল আবেদীন, মাওলানা সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা কামালউদ্দিন খান, মাওলানা সর্দার আবদুস সালাম, মাওলানা মুফতি আবদুস ছাত্তার, মাওলানা রুহুল আমীন, মাওলানা নজরুল ইসলাম, মাওলানা আবদুস শহীদ নাসিম, মাওলানা আবদুল খালেক মজুমদার, মাওলানা মিম ফজলুর রহমান, মাওলানা হারুনুর রশিদ খান, মাওলানা আবু তাহের মোঃ মাছুম, মাওলানা আতিকুর রহমান প্রমুখ।

সংগ্রাম ৩০/৭/২০০০

জাতীয় শরিয়া কাউন্সিলের বিবৃতি

চট্টগ্রামের হত্যাকান্ড ও কোটালীপাড়ার বোমা উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশ ও শাসকদলের সন্ত্রাসীরা দেশব্যাপী ভয়ঙ্কর তান্ডব সৃষ্টি করেছে। বহু নিরপরাধ লোককে গ্রেফতার করে নির্যাতন করছে। এতিম খানা, মাদ্রাসা ও ইসলামী পাঠাগারসহ বহু প্রতিষ্ঠানে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট ও ধ্বংস যজ্ঞ চালানো হয়েছে। বহু আলেম ও মুসুল্লিকে নির্যাতন করা হয়েছে। সরকারের সর্বোচ্চ স্তর থেকে প্রতিদিন যে ভাষায় বক্তব্য ও বিবৃতি দেয়া হচ্ছে তা

www.pathagar.com

রীতিমত উস্কানীমূলক ও উদ্বেগজনক। জাতির এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে জাতীয় শরীয়া কাউন্সিল নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে পারে না। আমরা এ ব্যাপারে সংযম অবলম্বন করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সবিনয় অনুরোধ জানাচ্ছি। জাতীয় শরীয়া কাউন্সিল মনে করে যে, এভাবে এক তরফা নির্যাতন, উস্কানী দেশকে নৈরাজ্যজনক অবস্থার দিকে ঠেলে দিবে। সে মতে জাতীয় শরীয়া কাউন্সিলের পক্ষ থেকে আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে আহ্বান জানাচ্ছি যে-

(ক) অবিলম্বে হামলা, গ্রেফতার, নির্যাতন, উস্কানীমূলক বক্তব্য বন্ধ করুন।

(খ) চট্টগ্রামের হত্যাকান্ড ও কোটালীপাড়ায় বোমা উদ্ধারের বিষয় দু'টি বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করে দোষীদের শাস্তি দেয়া হোক।

(গ) মসজিদ, মাদ্রাসা ও এতিমখানা ও দ্বীনদার লোকদের ইতিমধ্যে যে ক্ষতি করা হয়েছে তার উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া হোক। এতদসঙ্গে যে সব দুর্বৃত্ত এ সকল ন্যাক্কারজনক ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হোক।

আমরা এ ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছি যে, সময়মত সরকারীভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হলে যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হবে সেজন্য সরকারকেই দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে।

মাওলানা ওবায়দুল হক, মাওলানা মহিউদ্দিন খান, মাওলানা একে.এম ইউসুফ, মাওলানা মোসলেহউদ্দিন আহমাদ, মুফতী ছাঈদ আহমাদ মোজাদ্দেদী, মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী, মাওলানা আবদুছ সোবহান, মাওলানা কামাল উদ্দিন জাফরী, মাওলানা এডভোকেট নজরুল ইসলাম, মাওলানা যাইনুল আবেদীন।

দৈনিক সংগ্রাস ২৭/৭/২০০০

www.pathagar.com

আওয়ামী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন-১
পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট

চট্টগ্রামের আট খুনের নেপথ্যে হত্যাকান্ড ঘটালো কারা?
ছাত্রলীগের তিন প্রতিদ্বন্দ্বি গ্রুপ না শিবির

এনামুল কবীর রূপম চট্টগ্রাম থেকে ফিরে ঃ চট্টগ্রামের এইট মার্ডার কি শাসক দলীয় ছাত্র সংগঠনের অন্তর্কলহের জের নাকি অন্য কিছু? গতকাল শুক্রবার পর্যন্ত হত্যাকান্ডের তদন্তকারী সিআইডি কর্মকর্তারা এ রহস্যের কোন কিনারা করতে পারেনি। তবে তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানতে পেরেছেন ঘাতকরা হত্যা ঘটনার আগে মোবাইল ফোনে যাদের সাথে কথা বলেছে তারা শাসক দলেরই উচ্চ পর্যায়ের লোকজন। তদন্তের সাথে ঘনিষ্ঠ একটি দায়িত্বশীল সূত্র বলেছে, স্মরণকালের এই মর্মান্তিক হত্যার ঘটনার আগের দিন ছাত্র লীগের অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে তিনজন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হয়। এরই প্রতিশোধ হিসেবে এইট মার্ডার ঘটেছে কিনা সেই সম্ভাবনা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। তিন খুনের ঐ ঘটনা ঘটে ফটিকছড়ি থানার কাঞ্চন নগর এলাকায়। ছাত্রলীগের বিবদমান দু'টি গ্রুপের আধিপত্য বিস্তার নিয়ে বন্দুক যুদ্ধ হয়। তৈয়ব গ্রুপ ও টিপু গ্রুপের এ বন্দুক যুদ্ধ আধঘন্টা স্থায়ী হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে এলে সশস্ত্র ক্যাডাররা পাহাড়ী গহীন অরণ্যে লুকিয়ে পড়ে। এখান থেকে পুলিশ তিনজনের লাশ ও ক্যাডারদের ব্যবহৃত মোটর সাইকেল উদ্ধার করে। ঘটনায় নিহত ৩ জন তৈয়ব বাহিনীর অন্যতম ক্যাডার নাজিম গ্রুপের সদস্য খোরশেদ, ইলিয়াস ও মাসুদ। এরা ফটিকছড়ির ছাত্রলীগ নেতা ইয়াকুবের পিতার জানাযায় অংশ নিতে কাঞ্চন নগর গিয়েছিলো। জানাযা শেষে দু'টি মোটর সাইকেলযোগে এরা যখন ফিরে আসছিলো তখন একটি রাবার বাগানের কাছে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা বিপক্ষ গ্রুপের সন্ত্রাসীরা তাদের উপর ব্রাশ ফায়ার করে। এইট মার্ডার এই হত্যাকাণ্ডের পরদিনই ঘটেছে। হত্যাকাণ্ডটি এই ঘটনার প্রতিশোধ কিনা পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। এমনও হতে পারে টিপু গ্রুপ মনে করেছে নাসির বাহিনীর তাহের গ্রুপের লোকেরা এ ঘটনা ঘটিয়েছে। তাই তারা মাইক্রোবাস ধাওয়া করেছে।

ফটিকছড়িসহ গোটা চট্টলায় ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা কয়েকটি গ্রুপে বিভক্ত। মূখ্য তিনটি হচ্ছে নাসির বাহিনী, মামুন বাহিনী ও মাছ বাবু বাহিনী। নাসির বাহিনীর একটি অন্যতম গ্রুপ হচ্ছে তাহের গ্রুপ, আর মাছ বাবু বাহিনীর একটি প্রধান গ্রুপ হচ্ছে ছেড়া আকবর গ্রুপ। মামুন বাহিনীতে গ্রুপ না থাকলেও অন্যতম ক্যাডার হচ্ছে সুনীল ও কানাবক্কর। চট্টগ্রামের চাঁদাবাজির মূল এলাকা হচ্ছে নাসিরাবাদ। বর্তমানে এলাকাটি ছেড়া আকবর গ্রুপ ও তাহের গ্রুপের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এ নিয়ে উভয় গ্রুপে মাঝে মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ হয়ে থাকে। কয়েকদিন আগে দু'দলের বন্দুক যুদ্ধে ৩ জন আহত হয়। ছাত্রলীগের আয়োজন ছিলো পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে তারা ছাড়া অন্য কাউকে প্যানেল জমা দিতে দেবে না। কিন্তু প্যানেল প্রশ্নে ছেড়া আকবর গ্রুপ ও তাহের গ্রুপের মতবিরোধ হয়।

www.pathagar.com

শেষে কথা হয় সমঝোতার মাধ্যমে একটি প্যানেল দেয়া হবে। বেলা ১২টায় অনুষ্ঠিতব্য প্রতিবাদ সভা শেষে এই সমঝোতা বৈঠকের কথা ছিলো।

এ উদ্দেশ্যেই ছাত্রলীগ কর্মীরা অস্ত্রের মুখে শেরশাহ এলাকা থেকে মোহাম্মদী গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রির একটি মাইক্রোবাস জোর করে দখল করে নেয়। এই মাইক্রোবাসে করেই নিহতরা যাচ্ছিল। নীল মাইক্রোবাসটি এদের পিছু নেয়। পুলিশ মনে করছে সমঝোতা পন্ড করার লক্ষ্যে প্রতিপক্ষ এই এইট মার্ডার ঘটনা ঘটাতে পারে। ওদিকে নিহতরা যে অনুষ্ঠানে আসছিলো সেখানে অতিথি ছিলো আজম নাসির। মামুন গ্রুপের বিভিন্ন ক্যাডার সম্প্রতি আজম নাসির গ্রুপে চলে এসেছে। একারণে মামুনের নিয়ন্ত্রণাধীন নাসিরাবাদ এলাকা হাতছাড়া হবার উপক্রম হয়েছে। নাসিরাবাদ হচ্ছে সন্ত্রাসীদের অর্থ উপার্জনের প্রধানতম এলাকা। চোরাকারবারে সহায়তা, হুন্ডি ব্যবসা, জমাজমি দখলদারিত্ব, শিল্প এলাকার আধিপত্য করে এরা কোটি কোটি টাকা আয় করে। একারণেও এইট মার্ডার ঘটে থাকতে পারে বলে পুলিশের ধারণা। তবে পুলিশ এ হত্যার ঘটনার তদন্তে জামাত-শিবিরের সংশ্লিষ্টতার আভাস খুঁজে না পেলেও সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না। হত্যা ঘটনার তিনদিন আগে নব প্রতিষ্ঠিত কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট চালুর প্রথম দিনের সংঘর্ষকে পুলিশ একেবারে খাটো করে দেখছে না। ঐদিন সেখানে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে ঘন্টাব্যাপী বন্দুক যুদ্ধে কম করে হলেও ১০ জন আহত হয়। এই ঘটনার জের হিসেবে এইট মার্ডার ঘটে থাকতে পারে। তবে তদন্তকারীরা মনে করেন এ জন্য শিবিরের এতবড় হত্যাকাণ্ড ঘটানোর কথা নয়। তাছাড়া গাঢ় নীল রঙের মাইক্রোবাসটি সর্বাধুনিক অস্ত্র নিয়ে যেখান থেকে যাত্রা শুরু করে সেখানে ছাত্র শিবিরের কোন কর্তৃত্ব নেই।

দৈনিক জনতা- ২২/৭/২০০০

জনরোষ ঢাকতেই ৮ হত্যাকাণ্ডের দায় জামায়াত শিবিরের ঘাড়ে চাপানো হয়

শফিউল আলম ঃ বন্দরনগরী চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে গত ১২ জুলাই সন্ত্রাসী গ্রুপের ব্রাশফায়ারে ৬ জন ছাত্রলীগ ক্যাডারসহ ৮ জনের মৃত্যু এবং এর আগের দিন ফটিকছড়িতে নিজেদের মধ্যে বন্দুক যুদ্ধে ৩ জন ছাত্রলীগ ক্যাডারের মৃত্যুর ঘটনাবলীতে চট্টগ্রামে বর্তমান সরকার দলীয় ছাত্র রাজনীতি চূড়ান্ত মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তাৎক্ষণিকভাবে। বহুধা বিভক্ত ছাত্রলীগের আর্মস ক্যাডারদের মধ্যে ভয়ানক রক্তক্ষয় অনিবার্য হয়ে ওঠে।

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনসমূহের গত এক যুগের ক্রমবিপর্যয়ের ধারায় বহদ্দারহাটের হত্যাকাণ্ড দলকে ভেতর থেকে বিপন্ন করে তোলে এবং এতেই সরকার দলীয় নেতারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। বন্দরনগরীসহ বৃহত্তর চট্টগ্রামের প্রায় সর্বত্র আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গসংগঠনসমূহের প্রকাশ্য গ্রুপিং, কলহ-কোন্দলকে ঘিরে সশস্ত্র সহিংসতার ধরণ-ধারণ সম্পর্কে চট্টগ্রামবাসী কম বেশি পরিচিত। এই চেনা পরিচিত দৃশ্যপটকে ভিন্নরূপে

www.pathagar.com

ম্যাকআপ দিয়ে সাজিয়ে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিকে বিভ্রান্ত করা এবং একই সাথে চট্টগ্রামের সরকার দলীয় জনসমর্থনের শেষটুকু রক্ষা ও নিজেদের হতাশা, অসন্তোষকে ধামাচাপা দেয়ার জন্যই ৮ হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব চাপানো হয় জামায়াত-শিবিরের ঘাড়ে। তবে সরকারী মহলের এহেন অপকৌশলের ভেতর থেকে তাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড বা দ্বিমুখী চাতুর্য ফুটে উঠেছে। তাহল বহদ্দারহাট হত্যাকান্ডের কল্পিত প্রতিপক্ষ জামায়াত-শিবির উৎখাতের চরমতম উস্কানির সাথে সাথেই চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ সংগঠনসমূহের ভয়ঙ্কর কোন্দল-সহিংসতা মিটিয়ে ফেলার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা।

চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগের আন্তঃকোন্দল এবং কোন্দলের ফলে কিছুদিন পর পর বিভিন্ন গ্রুপে সশস্ত্র লড়াইয়ে হতাহতের ঘটনা নতুন কিছু নয়। দীর্ঘ প্রায় ১৩ বছর যাবত চলছে এই অন্তর্দলীয় সংঘাত। কিন্তু ১১ জুলাই ফটিকছড়ির ট্রিপল মার্ডার, ১২ জুলাই বহদ্দারহাটের ৮ হত্যাকান্ডের পরপরই কোন্দল নিরসনে হাইকমান্ড এত তৎপর কেন হল, কেন প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত চট্টগ্রামে ছুটে এসে ছাত্রলীগারদের সকল গ্রুপকে নিয়ে বসলেন এই প্রশ্ন এখন সচেতন চট্টগ্রামবাসীর মুখে মুখে। ওই দু'দফায় ১১ জনের মৃত্যুর পর ১২ জুলাই তাৎক্ষণিকভাবে হাইকমান্ডের নির্দেশে চট্টগ্রামে আসেন মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি, ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক অজয়কর খোকন। চট্টগ্রামে এসে তারা প্রথমেই আওয়ামী লীগ নেতা ও প্রভাবশালী কতক ক্যাডার নেতার সাথে আলোচনা করেছিলেন। ১৪ জুলাই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমও বহুধা বিভক্ত ছাত্রলীগারদের যে কোন মূল্যে ঐক্যবদ্ধ হবার তাগিদ দিয়ে সুস্পষ্টভাবে বলেন যে, দলীয় কোন্দলের কারণে চট্টগ্রামে আর কোন কর্মীকে যেন জীবন দিতে না হয়। অবশেষে গত ১৯ জুলাই প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা প্রায় দিনব্যাপী চট্টগ্রাম সফরকালে তিনি সার্কিট হাউজে স্থানীয় ছাত্রলীগের অন্তত ৪টি গ্রুপের নেতা-ক্যাডারদের সাথে বহুল আলোচিত এই রুদ্ধদ্বার বৈঠকটি করেন। সেখানে তিনি চট্টগ্রামে দলীয় গ্রুপিং, কলহ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত যে কোন উপায়ে মিটিয়ে ফেলে চট্টগ্রামে দলকে অস্তিত্বের সংকট থেকে রক্ষা করার জন্য নির্দেশ দেন এবং যতদূর জানা যায়, ঐ বৈঠকে কোন্দল প্রশ্নে তিনি অত্যন্ত কড়াস্বরে সকল নেতাকে সাবধান করে দেন।

এই প্রেক্ষাপটে ২০ জুলাই লালদীঘি ময়দানে চট্টগ্রামের ছাত্রলীগের ৩টি গ্রুপের ৪ জন করে ১২ জন নেতার প্রতিনিধিকে নিয়ে প্রেসিডিয়াম গোছের অভিনব স্টিয়ারিং কমিটি গঠনের ঘোষণা করা হয়। বলা হয়েছে এই কমিটি ঐক্যবদ্ধভাবে এখন থেকে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। কিন্তু ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রসম্মত কমিটি আপাতত গঠিত হচ্ছে না, বা সে রকম সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ। তদুপরি চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের প্রতাপশালী নেতা, সিটি মেয়র এবিএম মহিউদ্দীন চৌধুরী বর্তমানে বিদেশে অবস্থানের ফলে এবং কারাবন্দী চতুর্থ গ্রুপটির নেতা কাদেরের অনুপস্থিতির কারণে ভবিষ্যতে ছাত্রলীগের মেরুকরণ কোন দিকে গড়ায় তা এখন অস্পষ্ট। সেই প্রেক্ষিতে চট্টগ্রামের অভিজ্ঞ রাজনৈতিক মহলে গত ক'দিন ব্যাপক বলাবলি হচ্ছে যে, ১১ ও ১২ জুলাই দু'দুটি ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের পর খোদ প্রধানমন্ত্রী

www.pathagar.com

দলীয় সভানেত্রীর হস্তক্ষেপে চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের বিবদমান গ্রুপগুলো কলহ-সংঘাত মিটিয়ে ফেলার প্রক্রিয়াটি মোটেও ঐক্য প্রক্রিয়া নয়, বাস্তবে তা অস্ত্রবিরতি 'সিজ ফায়ার' প্রক্রিয়ামাত্র। এই অভিজ্ঞ সূত্র থেকে আরও জানা যায়, সরকারী মহল নিজেদের ক্রমাগত শক্তিক্ষয় ঠেকানোর জন্য চট্টগ্রাম ছাত্রলীগকে অস্ত্রবিরতির মাধ্যমে আপাতত শৃংখল পরিয়ে চট্টগ্রামে দলের বিপর্যয় রোধ ও ইমেজ রক্ষা করলেও তা দীর্ঘস্থায়ী বা অটুট থাকবে বলে কোন যুক্তি, সমর্থন খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে শুরু করে একশ্রেণীর নেতা-কর্মী বিরামহীনভাবে বক্তৃতা-বিবৃতিতে জামায়াত-শিবির উৎখাতের যে প্রচারণা দিয়ে চলেছেন তার উদ্দেশ্য যাই থাকুক অন্তত নিজ দলীয় তরুণ কর্মী-ক্যাডারদের পারস্পরিক রক্তক্ষয়, হিংসা, হানাহানিজনিত আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষয় বন্ধ হবে বলে সরকার দলীয় নীতিনির্ধারকরা মনে করছেন। কেননা, অতীতে গত এক যুগে আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ-সংগঠনসমূহ বিশেষত ছাত্রলীগের আন্তঃকোন্দল নিরসনে হাইকমান্ডের বিভিন্ন কৌশলী উদ্যোগ পুরোপুরি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অতঃপর বহদ্দারহাট মার্ডার ইস্যুকে মোক্ষম ও লাগসই কৌশল হিসেবে প্রয়োগ করা হচ্ছে জামায়াত-শিবির খোঁজাখুঁজি, ধরাধরির নামে। মনে করা হচ্ছে, এতে দলীয় অন্তর্ঘাতী ক্যাডার-কর্মীদের মাঝে জজবাও সৃষ্টি হবে, বিরোধী দলকেও শায়েস্তা করা সম্ভব হবে। কিন্তু অতীতের বিভিন্ন তিক্ত ঘটনা-অঘটন, নির্ঘটনের যারা নিরপেক্ষ সাক্ষী তারা বলছেন, চট্টগ্রামে জামায়াত-শিবির বিরোধী সরকার দলীয় অভিযান শেষ পর্যন্ত বুমেরাং হয়েই দাঁড়াতে পারে। কেননা চট্টগ্রাম বিরোধী দলের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে যেমন বিবেচিত, তেমনি দমন-পীড়নমূলক যে কোন অপরিণামদর্শী পদক্ষেপের ফলে চট্টগ্রামে অতীতে বারবার আন্দোলন-সংগ্রামের বিস্ফোরণ পরিলক্ষিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ঝিমিয়ে থাকা বিরোধীদল সমূহ ইতোমধ্যে বন্দর নগরীতে গণনিপীড়ন বিরোধী কঠোরতর আন্দোলনের যে আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে তা শেষ পর্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃতরূপ পরিগ্রহ করবে বলে আলামত পরিস্ফুট হয়েছে। তাছাড়া চট্টগ্রামে সরকার দলীয় রক্তস্নাত কোন্দলের যুগব্যাপী সমস্যা-সঙ্কটকে ধামাচাপা দিয়ে বিরোধী দলকে 'ক্ষেপিয়ে' বা 'উস্কে' দেয়ার অপকৌশল বস্তুত কোন সাংগঠনিক সমাধান নয় বলে মনে করেন চট্টগ্রামের সরকার দলীয় অনেক নেতাকর্মী। 'উৎখাতের' মিছিলে তাদের অনুপস্থিতিও লক্ষণীয়।

দৈনিক ইনকিলাম- ২৩/৭/২০০০

চট্টগ্রামের এইট মার্ডার

আওয়ামী লীগের অপপ্রচার সত্ত্বেও সিআইডি'র রিপোর্টে ভিন্ন তথ্য বেরিয়ে আসছে

চট্টগ্রাম ব্যুরো থেকে ফরিদ উদ্দিন চৌধুরী ঃ চট্টগ্রামের চাঞ্চল্যকর এইট মার্ডারের যতই দিন অতিবাহিত হচ্ছে ততই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। কারণ সরকারি দল আওয়ামী লীগ উক্ত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্যে সরাসরি জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করলেও সি.আই.ডি পুলিশের তদন্তে ইতিমধ্যে ভিন্ন তথ্য বেরিয়ে আসতে শুরু হয়েছে। এই চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ড তদন্ত

www.pathagar.com

করতে গিয়ে পুলিশ ঘটনার আগে ও পরে সন্ত্রাসীরা যে সব মোবাইল টেলিফোনে কথাবার্তা বলেছেন, সে সব মোবাইল ফোনের নাম্বার উদ্ধার করেছে। এতে দেখা যায়, এসব নাম্বার সরকারি দলের অংগ সংগঠন ছাত্রলীগের উর্ধতন ক্যাডারদের নাম্বার। এছাড়া ঘটনা তদন্ত করতে গিয়ে পুলিশ ঘটনার আগের দিন ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিহত তিন ক্যাডারের কোন প্রতিশোধ কিনা তাও তদন্ত করছেন। এছাড়া হত্যাকাণ্ডের দিন সকাল ৯টা থেকে ছাত্রলীগের আ.জ.ম নাসির গ্রুপ তথা তাহের গ্রুপের ৩০/৩৫জন ক্যাডার শেরশাহ কলোনিতে প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া প্রদানের সময় কাদের তথা ছেরা আকবর গ্রুপের বিরুদ্ধে শ্লোগান প্রদান, কাদের গ্রুপের সন্ত্রাসীরা এদের প্রতিরোধে পাল্টা রণ প্রস্তুতির খবর ইত্যাদি খতিয়ে দেখছেন। শুধু তাই নয়, বহদ্দারহাট মোড়ে সন্ত্রাসীদের হাতে তাহের গ্রুপের ক্যাডার নিহত হবার সাথে সাথে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের ভেতরে আটক কাদের গ্রুপের ছেলেরাই উল্লাস প্রকাশ করেছিল বলে কারাগার সূত্রে জানা গেছে। তাই পুলিশ তদন্তকালে এসব বিষয় বিবেচনায় আনছে বলে সূত্র জানিয়েছে। এদিকে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, তারা বহদ্দারহাটের চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকান্ডের মামলা এবং তদন্ত নিয়ে সরকার এবং উর্ধতন কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ব্যাপক চাপের মুখে পড়ে গেছে।

কারণ এই হত্যাকান্ডের মামলাটি ইতিমধ্যে একটি রাজনৈতিক মামলা হিসেবে রূপ নিয়েছে, কোন তদন্ত ছাড়াই উক্ত হত্যাকান্ডের জন্যে জামায়াত-শিবিরকে দায়ী করে তাদের ঘাড়ে দোষ চাপানোর কারণে পুলিশ অন্য কোন সাধারণ মামলার মতো এটি তদন্ত করতে পারছেন না বলে জানা গেছে।

দৈনিক জনতা- ২০/৭/২০০০

সরেজমিন চট্টগ্রাম-১

যারা চাঁদা দিতে গড়িমসি করেছে তাদেরই বানানো হয়েছে আসামী, বলা হচ্ছে রাজাকার

আবু রুশদ ঃ ইংরেজীতে 'উইচ হান্টিং' বলে একটা কথা আছে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার এ এক সহজ কিন্তু কার্যকর পদ্ধতি। মেকিয়াভেলি ও চাণক্যের সূত্রানুযায়ীও রাজনীতিতে এ ধরনের 'ডাইনী শিকারের' কথা শোনা যায়। সাম্প্রতিক চট্টগ্রামের পরিস্থিতি যেন অনেকটা তাই। স্তব্ধ, আতঙ্কিত বন্দর নগরীতে এখন চলছে সরকারী ইন্ধনে 'ধরো, মারো, কাটো'র প্রক্রিয়া। ১৯ জুলাই সকাল ছ'টা থেকে রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত চট্টগ্রামে অবস্থানকালীন বারবার মনে হয়েছে, এ যেন নাৎসী পার্টি শাসিত জার্মানীর প্রতিচ্ছবি, যেখানে আইন আছে কাগজে-কলমে। প্রশাসন প্রজাতন্ত্রের জন্য নয়, নিরীহ, সাধারণ জনগণের স্বার্থরক্ষা এখানে গৌণ। তাদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হল- সরকারী দলের আজ্ঞাবাহী লাঠিয়ালের ভূমিকা পালন করা। চট্টগ্রাম ঘুরে তাই মনে হয়েছে, এ বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক, সুসভ্য, একবিংশ শতকের বাংলাদেশ হতে পারে না। এখানে এখন সবাই

www.pathagar.com

আতঙ্কিত, একমাত্র 'সোনার সন্তানরা' ছাড়া। বিএনপি, জাপা, জামায়াত, ইশা আন্দোলন সমর্থক নেতা-কর্মী-জনতা যখন হিম শীতল আতঙ্কের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত কাটাচ্ছে তখন নীল-খাকি পোশাক পরা পুলিশ বাহিনীর ছত্রছায়ায় মহাবিক্রমে অস্ত্রহাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছাত্রলীগের চিহ্নিত ক্যাডার বাহিনী। সম্মিলিতভাবে এরা হামলে পড়ছে কথিত শিবির নিধনের উদ্দেশ্যে। যেন অলংঘনীয় দৈব এ নির্দেশ। খোদ সভানেত্রীর কাছ থেকে পাওয়া। তাই সে নির্দেশ পালনের প্রতিক্রিয়ায় একটির পর একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সীলগালা করে দেয়া হচ্ছে মানুষের রুজি-রোজগারের উৎসে, হোস্টেল-পাড়া-মহল্লায় চলছে অভিযান। ঐ তো শিবির। ঐ ব্যাটাই হত্যাকান্ডে জড়িত। 'সন্দেহজনক'- এ অভিযোগেই গ্রেফতার হচ্ছে অনেক। মাত্র ছ'দিনে ৬৭ জন। এর উপর 'ঘাতক বহনকারী নীল মাইক্রোতে আসা 'ঘাতক' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে আরো ৩০ জন। এদের ছবিসম্বলিত পোস্টারও ছাপা হচ্ছে শীঘ্র। কিন্তু ৩০ জন কিভাবে একটি মাইক্রোতে আরোহী হতে পারে? এ প্রশ্নের উত্তর জানার প্রয়োজন নেই কারো। এ মামলার এজাহারভূক্ত একজন আসামীও জানেন না তার নাম হত্যা মামলার আসামী হিসেবে নথিভুক্ত হল কিভাবে? অনেক সাবধানতা।

দৈনিক ইনকিলাব ২৩/৭/২০০০

চট্টগ্রামে ৮ হত্যা ঃ তড়িঘড়ি করে ড্রাইভার বাবুলের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

চট্টগ্রাম ব্যুরো ঃ চট্টগ্রাম মহানগরীর বহদ্দারহাটে চাঞ্চল্যকর ৮ হত্যা মামলার ১২ দিন পরে পুলিশ হত্যাকান্ডের মোটিভ উদঘাটনের প্রথম এবং একমাত্র উপাদান হিসাবে কথিত ঘাতকবাহী মাইক্রোবাস চালক বাবুল হোসেনকে খুঁজে পেয়েছে। এখন তার কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এ হত্যাকান্ডের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন এবং খুনীচক্রের সদস্যদের চিহ্নিত করার একটা সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তবে মামলার তদন্তকারী সিআইডি কর্মকর্তারা এ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হত্যাকান্ডের প্রকৃত রহস্য উদঘাটন করে খুনীচক্রকে চিহ্নিত করার দিকে আদৌ অগ্রসর হবেন কিনা সে ব্যাপারে জল্পনা-কল্পনা চলছে। কেননা লোমহর্ষক এ হত্যাকান্ডের পরপরই এর কল্পিত দায়দায়িত্ব প্রতিপক্ষের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে সরকারী মদদে জামায়াত-শিবিরসহ সাধারণ মানুষের ওপর পুলিশের নজিরবিহীন ক্র্যাকডাউন চলছে। মাইক্রোবাস চালক বাবুল হোসেনকে আটক করার মাত্র কয়েক ঘন্টার মাথায় তাকে রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদের আগেই ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারা মতে, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী গ্রহণের ঘটনায় রহস্য আরো ঘনীভূত হচ্ছে। তাহলে সিআইডি বাবুল হোসেনকে কি ট্রাম্পকার্ড হিসাবে ব্যবহার করছে?

দৈনিক ইনকিলাব ২৫/৭/২০০০

www.pathagar.com

৮ হত্যাকাণ্ড ॥ মুজিব্যা আটক

ছাত্রলীগের একটি গ্রুপের সহায়তায় শিবির এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নগরীর বহদ্দারহাটসহ তৎসংলগ্ন বাস টার্মিনাল এলাকার ডন মুজিব-উদ-দৌলা ওরফে মুজিব্যাকে গতকাল সোমবার আটকের পর প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে সে বলিয়াছে, বহদ্দারহাট ৮ হত্যাকান্ডে হাবিব ও সাজ্জাদ জড়িত ছিল। ছাত্রলীগের আজম নাসির গ্রুপের একটি বিরোধী অংশের সহায়তায় শিবির এ হত্যাকান্ড ঘটাইয়াছে। চান্দগাঁও পুলিশ কর্তৃক অপরাহ্ন সাড়ে ৩টার সময় খাজা রোড এলাকা হইতে মুজিব্যাকে আটকের পর পরই নিরাপত্তার জন্য কোতয়ালী থানায় আনা হয়। কোতয়ালী থানায় সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে সিএমপি'র উপ পুলিশ কমিশনার (নর্থ) নব বিক্রমকিশোর ত্রিপুরা মুজিব্যাকে ৮ হত্যার ব্যাপারে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি হত্যাকারীদের ব্যাপারে তথ্য প্রদান করিতে বলেন এবং তাহার (মুজিব্যা) জড়িত থাকার ব্যাপারে জানতে চান। কিন্তু মুজিব্যা তাহার সংশ্লিষ্টতার বিষয় অস্বীকার করে এবং কাহারা হত্যাকান্ডে জড়িত ছিল তাহা জানে না বলিয়া জানায়। মুজিব্যা জানায় সে শিবির করে না বা শিবিরের সন্ত্রাসীদের সহিত তাহার কোন সংশ্লিষ্টতা নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক- ২/৮/২০০০

মুজিব্যার চাঞ্চল্যকর তথ্য ঃ ছাত্রলীগের সহযোগিতায়

পেশাদার খুনী চক্র চট্টগ্রামের ৮ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে

রফিকুল ইসলাম সেলিম ঃ মহানগরী চট্টগ্রামের মুজিব-উদ-দৌলা ওরফে মুজিব্যা ৮ হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পুলিশকে চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ২৬ মামলার আসামী মুজিব্যা জানিয়েছে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপের সহযোগিতায় পেশাদার খুনী চক্র বহদ্দারহাটে ৮ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। আর এ তথ্য মামলার তদন্তকারী সিআইডি কর্মকর্তাদের হিসাবকে গরমিল করে দিয়েছে। সিআইডি মুজিব্যাকে রিমান্ডে এনে ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করবে।

দৈনিক ইনকিলাব- ২/৮/২০০০

বিরোধী জোটকে দায়ী করতে তারাই বোমা পুঁতে রেখেছিল

রিপোর্টার্স ইউনিটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে মান্নান ভূঁইয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ঃ বিএনপির মহাসচিব আব্দুল মান্নান ভূঁইয়া আগামী নির্বাচন প্রসঙ্গে বলেছেন, আমরা একাই যথেষ্ট। আগামীতে বিএনপি এককভাবে নির্বাচন করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাবে তবুও দেশে একটা স্থিতিশীল সরকার গঠনের জন্য আমরা জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করার চেষ্টা করছি। গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া থেকে উদ্ধার করা

www.pathagar.com

শক্তিশালী বোমার সঙ্গে চারদল জড়িত এ ধরনের অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, চারদলকে দায়ী করার জন্য তারা নিজেরাই এটি পুঁতে রেখেছিল। তবে তিনি বোমা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, সত্যিই যদি বোমা হয়ে থাকে, তাহলে আমরা উদ্বিগ্ন এবং এর বিরুদ্ধে আমরা রুখে দাঁড়াবো।

গতকাল সোমবার সকালে সেগুনবাগিচাস্থ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটের অডিটরিয়ামে 'মিট দ্য রিপোর্টার্স' অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে জনাব মান্নান ভূঁইয়া একথাগুলো বলেন। বিএনপি মহাসচিব এই অনুষ্ঠানে প্রায় পৌনে এক ঘন্টা দেশী-বিদেশী সংবাদ সংস্থাসহ বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকের রিপোর্টারদের বিভিন্ন প্রশ্নের খোলামেলা জবাব দেন।

দৈনিক মুক্তকণ্ঠ- ২৫/৮/২০০০

ছাত্রলীগ নেতাদের জড়িত থাকার বিষয় নিশ্চিত

কোটালীপাড়ায় বোমা পুঁতে রাখার সাথে ক্ষমতাসীন দলের একটি অংশ ও বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত

সংগ্রাম রিপোর্ট ঃ কোটালীপাড়ায় বোমা পুঁতে রাখার ঘটনার সাথে ক্ষমতাসীন দলের একটি উচ্চমহল এবং একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার জড়িত থাকার বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোটালীপাড়ায় বোমা পুঁতে রাখার ঘটনার সাথে স্থানীয় ছাত্রলীগ নেতাদের জড়িত থাকার ব্যাপারে একাধিক সংবাদপত্রে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে এবং পুলিশের সূত্র থেকেও স্বীকার করা হয়েছে।

এই বোমা পোঁতার ঘটনার সাথে জড়িত সন্দেহে যাকে খুঁজা হচ্ছে সেই মুফতী হান্নানের পুরো পরিবার আওয়ামী রাজনীতির সাথে জড়িত। মুফতী হান্নান নিজেও কৃষক লীগের কর্মী। বোমা পুঁতে রাখার কাজে ব্যবহৃত সাদা গাড়ীটি ব্যবহার করেছেন ছাত্রলীগ নেতারা। এই গাড়িটি ব্যবহার করেছেন মুফতী হান্নানের তৃতীয় ভাই ছাত্রলীগ নেতা ইকবাল, তার পঞ্চ ভাই ছাত্রলীগ নেতা আনিস, শেখ লুৎফর রহমান কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক বাচ্চু হাজেরা, থানা ছাত্রলীগের সহসভাপতি ফিরোজসহ স্থানীয় প্রভাবশালী ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যাচ্ছে, কোটালীপাড়ায় বোমা পুঁতে রাখার ঘটনার সাথে স্থানীয় ছাত্রলীগের পুরো নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা হয়েছে। মুফতী হান্নানকে যদি হরকাতুল জিহাদের সদস্য হিসেবে ধরে নেয়া হয় তাহলে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকার ছাত্রলীগ নেতাদের এ ঘটনার সাথে জড়িত করা কতটুকু সম্ভব তা একটি প্রশ্ন সাপেক্ষ বিষয়। এছাড়া মুফতী হান্নানের পুরো পরিবার আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। এই ঘটনার জন্য দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার প্রয়োজন ছিলো। মুফতী হান্নানের বাসায় বা তার আত্মীয়-স্বজনের বাসায় বসে পরিকল্পনা নেয়া হলেও তা জানাজানি হয়ে যাওয়ার কথা।

প্রকাশ, বোমা পুঁতে রাখার কাজে ব্যবহৃত গাড়িটি প্রথম বোমা উদ্ধারের দিন ২০শে জুলাইয়ের সাত আট দিন আগে থেকে প্রত্যহ দিনে রাতে গোপালগঞ্জ থেকে কোটালীপাড়া যাতায়াত করেছে। কিন্তু পুলিশ বা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা রক্ষায় পূর্ব থেকে নিয়োজিত

www.pathagar.com

গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যরা গাড়ীটি তল্লাশি করেনি। অর্থাৎ বোমা পুঁতে রাখার জন্য ছাত্রলীগকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই ছাত্রলীগ নেতাদেরকে কে বা কারা ব্যবহার করেছে তা আরো অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। কারণ, হরকাতুল জিহাদের মতো নামসর্বস্ব কোন সংগঠনের পক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী এলকায় একনিষ্ঠ ও স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী নেতাদের কিভাবে ব্যবহার করা সম্ভব? একজন বা দু'জন ব্যক্তিকে ব্যবহার করা হয়তো সম্ভব, কিন্তু পুরো সাংগঠনিক শক্তিকে হরকাতুল জিহাদ ব্যবহার করেছে, এটা অযৌক্তিক এবং অবিশ্বাস্য।

জানা গেছে, এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মহসীন হলের ছাত্রলীগ নেতা খায়রুল আলম মুনীরকে গ্রেফতার করেছে। তার বাড়ীও গোপালগঞ্জের মিয়া পাড়ায়। ছাত্রলীগের একজন কেন্দ্রীয় নেতার নির্দেশে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। এছাড়া এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে কামালউদ্দীন শাকের নামে আরেক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তিনি ফরিদপুর জেলা যুবলীগের অর্থ সম্পাদকের ছোট ভাই। এসব ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে প্রধানমন্ত্রীর এই হত্যা প্রচেষ্টার ঘটনার সাথে ক্ষমতাসীন দলের একটি মহল জড়িত।

আমাদের দক্ষিণাঞ্চলীয় প্রতিনিধি জানান, দীর্ঘদিন থেকেই মুফতী হান্নানের সাথে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে চমৎকার সম্পর্ক রয়েছে বলে কয়েকজন এলাকাবাসী বলেছেন, দীর্ঘদিন থেকেই এলাকাবাসী বলছেন, দীর্ঘদিন থেকেই কোটালীপাড়া অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের দখলে। সেই কারণে তাদের গতিবিধিকে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা সন্দেহের চোখে দেখেনি। এ কারণে বোমা দু'টি যে তাদের একটি অংশের সহায়তায় পুঁতে রাখা হতে পারে তা অনেকটা নিশ্চিত। সাধারণ জনগণের প্রশ্ন ঃ বোমা পুঁতে রাখার সন্দেহে জেলা জামায়াত নেতৃবৃন্দসহ ইসলামী ব্যাংক গোপালগঞ্জ শাখার ম্যানেজারকে কেনো গ্রেফতার করা হলো? এ প্রসঙ্গে স্থানীয় নিরপেক্ষ মহল বলছেন, "সরকার বিরোধী জোটের ঐক্যে ফাটল ধরাতে এবং দেশবাসীর কাছে তাদের ভূমিকাকে প্রশ্নের সম্মুখীন করতে এ ধরনের অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে।

গতকাল শনিবার পর্যন্ত কোটালীপাড়া ও গোপালগঞ্জের কয়েকটি এলাকায় সরেজমিনে গেলে কোনো নিরপেক্ষ সূত্রই বোমা পুঁতে রাখার ঘটনায় জামায়াত নেতৃবৃন্দের সংশ্লিষ্টতাকে স্বীকার করেননি। বরং তারা বলেছেন, বিষয়টি সরকারী দলের রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। আর সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা বাহিনী উক্ত ঘটনায় জামায়াত নেতৃবৃন্দের জড়িত থাকার ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রমাণ পেয়েছেন বলে মনে হয় না।

তবে পুলিশ সংশ্লিষ্ট নেতৃবৃন্দের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহে অনেকটা সফল হয়েছে বলে দাবী করছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে আওয়ামী নেতাদের সাথে ঘনিষ্ঠ একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী এ ঘটনা ঘটানো হতে পারে। আওয়ামী রাজনীতির কূটকৌশল হিসেবে এখন ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার

www.pathagar.com

জন্য ঘটনার সাথে জড়িতদের গ্রেফতার না করে এবং তাদের জিজ্ঞাসাবাদ না করে ইসলামপন্থীদের ওপর এর দায় চাপানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। এখন নিরীহ ব্যক্তিদের এ ঘটনার সাথে জড়িত করে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে তাদের উপর নির্যাতন চালানো হচ্ছে।

দৈনিক সংগ্রাম ৩০/৭/২০০০

সরকার কি পুলিশ ও দলীয় কর্মীদের খুনের লাইসেন্স দিলেন!

এলাহী নেওয়াজ খান ঃ সাম্প্রতিককালে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে এমন সব বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়া হচ্ছে- যা দেশের বিবেকবান ও সভ্য মানুষকে স্তম্ভিত ও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে। বিশেষ করে গত ১৯ জুলাই চট্টগ্রামে দলীয় নেতা-কর্মীদের সভায় সরকারের শীর্ষপদ থেকে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে, তা রীতিমত গা শিউরে ওঠার মত। গত ২০ জুলাই সরকার সমর্থক 'প্রথম আলোতে' প্রকাশিত ঐ বক্তব্যের অংশ বিশেষ হচ্ছে- "চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ কি শাড়ি-চুড়ি পরেন? তারা কি মরে গেছেন? আর যদি একটা লাশ পড়ে তবে ভবিষ্যতে ১০টি লাশ পড়বে।" স্পষ্টত এই বক্তব্যের লক্ষ্য ছিল জামায়াত-শিবির। এমনকি সরকারের উচ্চপদ থেকে রাজাকারদের তান্ডব মেনে নেয়া যায় না; নকশালী দমনের মত ব্যবস্থা গ্রহণ করারও নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রথমত, সরকার কি একটা খুনের বদলায় ১০টি খুন করার কথা বলে দলীয় নেতা-কর্মী ও পুলিশকে নির্বিচারে মানুষ খুন করার লাইসেন্স প্রদান করলেন? দ্বিতীয়ত, চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ কি শাড়ি-চুড়ি পড়ে বসে আছে বলে কি ক্ষমতাসীন দলীয় নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উস্কানী দিলেন? যার অর্থ দাঁড়ায় কি এক খুনের বদলে ১০ খুন করতে উদ্বুদ্ধকরণ। তৃতীয়ত, নকশাল দমনের মত ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলে কি ১৯৭৪ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার যেভাবে নকশাল দমন করেছিল, সে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। এখনও এ দেশের অনেকের স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে যে, ১৯৭৪ সালের সরকারপ্রধান খুলনায় এক জনসভায় আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নকশাল দেখামাত্র গুলী করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখন এই নির্দেশের তীব্র সমালোচনা হয়েছিল। এমন কি, তখন মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে ঐ নির্দেশের তীব্র সমালোচনা করে বলেছিলেন, 'নকশাল কি গায়ে লেখা থাকে যে, গুলী করে মারবা।' সুতরাং বর্তমানেও জনগণের মধ্যে সেই একই প্রশ্ন- রাজাকার' কি গায়ে লেখা থাকে? রাজাকারকে যদি চিহ্নিত না করা যায়; তাহলে পুলিশ কিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নাকি রাজাকার বলতে সরকারবিরোধী দলকে বুঝানো হয়েছে।

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, একটি হত্যার বদলে ১০টি হত্যা করার আইনগত উৎস এ সরকার কোথা থেকে পেলেন? না কি বর্তমানে আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে এমন এক জঙ্গলের শাসন কায়েম করতে যাচ্ছেন, যেখানে 'জোর যার মুল্লুক তার' আইন কার্যকর। পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এ ধরনের বক্তব্য সম্পূর্ণভাবে সংবিধানবিরোধী এবং বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের প্রতি মারাত্মক হুমকিস্বরূপ।

www.pathagar.com

আমাদের সংবিধানের মূল প্রস্তাবনার তৃতীয় প্যারায় বলা হয়েছে, "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম মূল লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বর্তমান সরকার সংবিধানের ঐ মূল প্রস্তাবনা বাদ দিয়েছে কিনা? যদি না দিয়ে থাকে তাহলে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে ঐ ধরনের বক্তব্য সংবিধানবিরোধী নয় কি?

আবার সংবিধানের ৩১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে "আইনের আশ্রয় লাভ এবং আইন অনুযায়ী ও কেবল আইন অনুযায়ী ব্যবহার লাভ যেকোন স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষত আইনানুযায়ী ব্যতীত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে।"

এখন এই প্রশ্ন করা যায় না যে সরকার কোন সংবিধান এবং দেশের কোন আইন বলে নকশাল দমনের মত ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ১টি হত্যার বদলে ১০টি হত্যার কথা বলছেন? অথচ এ সরকার সংবিধান রক্ষার শপথ গ্রহণ করেছে।

আজ সর্বমহলে আতঙ্ক এ কারণেই ছড়িয়ে পড়েছে যে, সরকার সংবিধান বহির্ভূত নির্দেশ জারী করেছে। অর্থাৎ 'এক্সট্রা কনস্টিটিউশনাল' তৎপরতা। এতে ক্ষমতাসীনরা ছাড়া আর সকল নাগরিকেরই ন্যায় বিচার লাভের সম্ভাবনাকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। বলা যায়, আইনের শাসনকে সম্পূর্ণ পদদলিত করা হয়েছে। তবে পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এখন যদি রাজাকার নামধারী কোন ব্যক্তি হত্যার শিকার হয়, কিংবা যে কোন ব্যক্তি পুলিশ কিংবা ক্ষমতাসীনদের দ্বারা হত্যার শিকার হয়; তাহলে তার দায় দায়িত্ব কার ওপর বর্তাবে।

দৈনিক ইনকিলাব- ২২/৭/২০০০

সন্ত্রাস, হত্যা ও আওয়ামী কৌশলের পরিণতি

প্রথম আলো (সোমবার, ১৭ জুলাই ২০০০) খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি খবর দিয়েছেঃ 'জামায়াত-শিবিরকে আঘাত করে বিরোধী জোটকে চাপে রাখতে আওয়ামী লীগের কৌশল। খবরে বলা হয়েছে, 'চট্টগ্রামে ছয়জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীসহ আটজনের হত্যাকারী শিবির ক্যাডাররা-এই সাধারণ অভিযোগের পটভূমিতে আওয়ামী লীগ জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে রাজনৈতিক প্রচারাভিযানের উদ্যোগ নিয়েছে।' এই প্রচারাভিযান অনেকটা যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহণ করেছে। সারা দেশেই ছাত্রলীগ-শিবির মুখোমুখি। শেখ হাসিনা মন্তব্য করেছেন 'পড়ে পড়ে কি শুধু মার খাব?' তার মানে কী? তিনিও মার দেবেন? দেখা যাচ্ছে আইন, রাষ্ট্র, পুলিশ ও প্রশাসন সম্পূর্ণ গৌণ একটা ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ইসলামী ছাত্রশিবির যেহেতু ছাত্রলীগ কর্মীদের মেরেছে, অতএব তাদেরকেও মারতে হবে।

প্রথম আলোর খবরের ইঙ্গিতটা হচ্ছে অনেকটা এই রকম। চট্টগ্রাম হত্যাকান্ডের সঙ্গে

www.pathagar.com

জামায়াত-শিবির জড়িত কিনা সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। কারণ হত্যাকারী এখনো ধরা পড়েনি। বলা বাহুল্য, জামায়াত শিবির এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে অবশ্যই। সেটা সত্য হতে পারে, কিংবা হয়তো সেটা নিছক অনুমান। এই অনুমান অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নয়। কারণ ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে জামায়াত-শিবিরের অভিযান চালানোর মতো পরিস্থিতি চট্টগ্রামে অবশ্যই রয়েছে। শেখ হাসিনা বিষয়টি নিয়ে কয়েকজন সাবেক ছাত্রনেতার সঙ্গে আলাপ করার সময় 'জামায়াত-শিবিরের পাশাপাশি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেও জনমত গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। ছাত্রলীগের ওপর এই আঘাতের উৎস হতে পারে যেকোনো সন্ত্রাসী প্রতিপক্ষ।

কিন্তু প্রথম আলোর প্রতিবেদন স্পষ্ট যে, পুরো বিষয় পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠার আগে ঘটনাটি আওয়ামী লীগ ব্যবহার করছে প্রতিপক্ষ বিরোধী জোটকে ঘায়েল করার জন্য। তারা দাবী তুলেছে, জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক। এটা প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী একটা রাজনৈতিক কৌশল। যদি প্রথম আলোর এই মূল্যায়ন সঠিক হয় তাহলে এই কৌশল জামায়াত-শিবিরকে দুর্বল করা দূরের কথা-সাংগঠনিক ও সামরিক উভয় দিক থেকেই বরং তাদের শক্তিশালী করবে। জামায়াত-শিবির অতি অনায়াসে তাদের ক্যাডারদের বোঝাতে সক্ষম হবে যে, কোনো প্রকার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া রাজনৈতিক ফায়দার জন্য আওয়ামী লীগ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এতে জামায়াত-শিবিরের ক্যাডারদের মনোবল বৃদ্ধি হবে। দ্বিতীয়ত রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি মূলত পরাজিতের দাবি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে আওয়ামী লীগের এই দাবি দলের রাজনৈতিক শূন্যতা এবং মেরুদণ্ডহীনতাই প্রমাণ করে।

জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, আওয়ামী লীগ তার প্রতিপক্ষের কাছে হারছে। না, সন্ত্রাসী হামলা ও পাল্টা হামলায় নয়। রাজনৈতিকভাবে হারছে। জনগণের চোখে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী প্রতিটি দলই সন্ত্রাসী। সন্ত্রাস ছাড়া সুস্থ রাজনীতির মুরোদ এদের কারুরই নেই। অতএব এক সন্ত্রাসীর হাতে আরেক সন্ত্রাসীর মার খাওয়াটা হার নয়। কিন্তু জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা রাজনৈতিক পরাজয়। জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবি আওয়ামী লীগের দূর্বলতাই প্রমাণ করছে। সন্ত্রাসী ক্ষমতার দিক থেকে যতটা না, তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে দুর্বলতা। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়, অথচ আশ্চর্য যে সন্ত্রাস দমন করতে পারছে না। এটা খুবই লজ্জার কথা। যদি জামায়াত-শিবির এই হত্যাকান্ডে জড়িত থাকে তাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেই। যদি থাকে তাহলে হত্যাকারী এতক্ষণে ধরা পড়ার কথা এবং তাদের শাস্তি হওয়ার কথা। সেটা হয়নি, অথচ রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। এখানেই পরাজয়।

তাছাড়া রাজনীতি নিষিদ্ধ করলেই রাজনীতি বন্ধ হয় না। বরং সেই রাজনীতির পক্ষে জনমত আরো পোক্ত হয়। তার শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী লীগের এই কৌশলের পরিণতি আওয়ামী লীগের জন্য আত্মঘাতী হতে পারে। দেশের জন্যও বটে। এটা কি

www.pathagar.com

জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি মোকাবিলা করার সঠিক রাজনৈতিক কৌশল হতে পারে?

বিষয়টি আরো জটিল হয়ে গেছে, কারণ ১৪ জুলাই, শুক্রবার দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় একটি খবর বেরিয়েছে। ইত্তেফাকের খবরে বলা হয়েছে, আটটি হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে 'জাতীয় বিপ্লবী কাউন্সিল' নামের একটি সংগঠন প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদন্ডের প্রতীক হিসেবে এই হত্যাকান্ড কার্যকর করা হয়েছে। সাদা কাগজে টাইপ করা এবং জাতীয় বিপ্লবী কাউন্সিলের কমান্ডার ইন চিফের নামে ১২ জুলাই তারিখে অস্পষ্ট স্বাক্ষরে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, 'অদূর ভবিষ্যতের জন্য আমরা দেশ ও জাতির স্বার্থে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছি। ভবিষ্যতে ব্যাপক কর্মসূচীর মধ্যে থাকিবে দেশের সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের লাগামহীন চাঁদাবাজী ও হয়রানি বন্ধে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদন্ড এবং দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী নির্মূল অভিযান। এ ব্যাপারে আমরা রাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তি হইতে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ কামনা করিতেছি। সরকার বা প্রতিপক্ষ কোনো কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া কোনো সুফল আশা করতে পারেন না। আমরা এলটিটিই হইতে ভয়ানকরূপে আবির্ভাব হইব।'

প্রথম আলো- ২২/৭/২০০০

Bahaddarhat Killing

Intelligence Report Differs With Govt. Posture

The English daily The New Nation published the following exclusive report after investigating on the spot on July 24.

"The Intelligence agency set to unearth the mystery of Bahaddarhat 8-murder in Chittagong last week has submitted its report to relevant authorities a couple of days ago.

The report contradicts the now well-known stand of the government which in effect has launched a witch-hunt against a political party across the country.

It is learnt from the relevant sources that the report had concluded that the deaths were result of internal conflicts of ruling party's student wing in Chittagong.

The Bahaddarhat killings may not have taken place if the killings of three BCL activists had not taken place at Fatikchhari.

Faction-ridden BCL each faction owing allegiance to one AL leader in Chittagong were locked in conflicts over possession of Government Commercial Institute which shifted to its new location at Bahaddarhat.

www.pathagar.com

The possession of the institute was important because whoever controlled it could earn huge amount through extortion in the area, a commercial hub of the port city.

Present conflict centered on forming a BCL panel for Chittagong Polytechnic Institute, the report said. This institute was dominated by Jatiyatabadi Chhatra Dal for seven years before they were forcibly ousted by Bangladesh Chhatra League after Awami League went to power.

One of the five intelligence agencies which are investigating the entire development submitted this report assigning three reasons for the murders.

The report said, Bahaddarhat killing was sequel to Fatikchhari incident in which three BCL activists were killed in inter-faction fighting at Fatikchhari just 20 hours before the 8-murders.

The intelligence report said two rival factions of BCL one led by Chhera Akbar and another by Taher met in the night of July 11 to set up panel for election of student union of Chittagong Polytechnic Institute. The meeting was inconclusive. They then decided to meet next day. These groups are also supported by Mayor Mohiuddin Chowdhury and AZM Nasir.

The meeting on finalisation of panel to the elections of Polytechnic Institute was inconclusive in the night and activists of AZM Nasir led group (Taher faction) told the Chhera Akbar led group that they would settle the issue next day after attending a protest meeting to be held at Commercial Institute which was shifted from its old place Nasirabad to Bakulia.

The opening day of Chittagong Government Commercial Institute at its new location was on July 10 and on that day both the factions tried to get possession of new premises. The rival conflicting groups- Chhera Akbar group and the Taher Group-were driven out from the campus by both the Chhatra Shibir and the Chhatra Dal activists and nine of the activists of both factions received injuries in a clash there.

Protesting the act, the Taher group called a protest meeting at the Government Commercial Institute reportedly to drive away the Chhatra Shibir activists forcibly.

In the meantime, Chhatra League activist Yukub's father died at Fatikchhari and four activists of Chhatra League AZM Nasir fac-

www.pathagar.com

tion went to Fatikchhari to attend the Janaza of Yukub's father.

As they were returning to Chittagong by four motor bikes, these activists were reportedly attacked at Kanchannagar where another faction of Chhatra League opened fire on them from the Rubber Plantation Garden of Abul Kalam killing three of them-Khurshed, Elias and Masud on the spot at 12 noon on July 11.

The Taher faction blamed the Chhera Akbar group for the killing and some activists of Chhatra League at Fatikchhari joined the Taher faction for taking revenge.

A meeting protesting the assault took place on July 12 at new premises and decided to take revenge of killing of three activists who attended the Janaza of activist Yakub's father.

The Taher faction of Government Commercial Institute of Chhatra League managed a microbus bearing number Chittagong Metro Cha-11-0848 and left Sher Shah Colony Area for Government Commercial Institute. Former Vice President of Commercial Institute Student Union Hasibur Rahman Helal, Rafiqul Islam Sohag, Jahangir Alam, Abul Kashem and five others were in the bus.

The killers who were in another microbus also started following them and when the microbus with the victims arrived at Bahadderhat, the killers reportedly sprayed bullets four times."

Another report published in the same daily on July 25 reads as follows :

"Intense rivalry among various factions of Bangladesh Chhatra League (BCL) has led to killing of some 134 party workers in last one decade. It intensified since Awami League went to power four years ago.

This rivalry is also dominating ruling party's national politics and held business, industry and other social interaction in the port city hostage.

Police plays the role of sustainer and act on occasions as the party workers.

This is the summary of impression that this correspondent got from talks and interviews with a large number of people including local leaders, businessmen and common men.

The reason of intense conflict is share of booty which include

www.pathagar.com

daily collection of about Tk 50 lakh as extortion, occupation of land and buildings, smuggling of gold, foreign goods and drugs, illegal loans from banks beside portion of toll on those who obtain loan.

Even though, sources said, these factions curved out zone of operation among themselves by ousting Jatiyatabadi Chhatra Dal (JCD) and Shibir from most of the areas, they do not feel complete sway in some areas. Two institutions are still in control of Islami Chhatra Shibir which the BCL wants to occupy.

Local leaders alleged that police often act as the phalanx of the ruling party and offer shelter and support to these cadres involved in crimes.

They said that police support was purely conditioned by financial gains. Funds roll down to them whenever a crime takes place, leaders alleged.

The BCL in Chittagong is divided into three groups, each faction led by one 'godfather' who is a prominent leader of the party.

These godfathers had quit student politics a decade ago. But they are rich men. They owe their wealth to the illegal activities of these cadres they control. Through them, the godfathers occupy government land, throw out others, extort business and traders and conduct killings of targeted persons most of whom were their rivals.

Sources said if police wanted to intervene in Bahaddarhat conflict, it was easy for them. Because the killing took place only 25 yards of a police outpost. They suspect police did not intervene or took note of the people because they could recognise the groups.

Manufacture of excuses to Clamp down on opposition?

By Sadeq Khan

The leaders of the 4-party opposition alliance are now confidently saying that the Bahaddar Bari massacre of eight persons, including six ruling party student wing leaders, by brushfire in a microbus was the result of factional ambush pre-planned by rival ruling party men. It was a natural consequence of the politics of firearms and musclemen retained by the ruling party, which now

www.pathagar.com

seeks to perpetuate its rule not by winning hearts but by fanning terror. The hate campaign unleashed by the ruling party and government ministers against Jamaat-Shibir calling for ban on their political activities as well as random arrests of many activists of other opposition parties (alongwith Jamaat-Shibir supporters) in many parts of the country without any specific charges, combined with transparent attempts by ruling party men to provoke bloody clashes with opposition activists on petty excuses, are being seen as acts of a diversionary drama. To quote the BNP Secretary General talking to newsmen in Reporters Unity, the government is out to reap "ugly political benefits" out of the Chittagong massacre, which the Leaders of the Opposition, Khaleda Zia, in her public address on July 25 at Dhaka Paltan Maidan unequivocally declared to be the "outcome of intra-party feud" of the Awami League. Newspaper reports have cited the contrary position of government intelligence reports and the investigation agency presumptions. Police leaks to pro-government newspapers has ascribed dispute over who controls "chandabazi" extortion racket at Bahaddarhat Bus Terminal as the cause of the massacre, but also suggested that some of the suspected killers were close to a named terrorist of Bahaddarhat, who is known to be a Shibir cadre. Opposition-leaning newspapers have cast doubts on the "ready" confession of the detained driver of the van used by the unidentified killers and on the reported confession of murder obtained from another detainee, said to be himself a Shibir cadre.

Opposition leaders have demanded a judicial inquiry into the incident, and roundly condemned the Prime Minister's "blood for blood" rhetoric in Chittagong, implicating Jamaat-Shibir for the killing of her student activists. Khaleda Zia mentioned in her speech on July 25 that as many as thirty murders have taken place of late due to factional rivalries within the ruling party. She castigated the Prime Minister for the latter's remark that if one more dead body falls (from ruling party ranks), ten dead bodies will be brought down (from the opposition ranks). Khaleda Zia said people have completely lost faith in a Prime Minister who "ordered her party activists to kill opponents". General Ershad said, "No Prime Minister of sound mind" can order her following publicly to undertake revenge killings.

In fact, the credibility gap that has developed in the public mind

www.pathagar.com

about the ruling party claims on law and order issues and the government's failure to act against known terrorists and murderers under ruling party umbrella is now rebounding on what the opposition is terming as another diversionary drama over bomb attempts on the Prime Minister's life in her own home district of Gopalganj. BNP Secretary General Abdul Mannan Bhuiyan told Reporters Unity, "We are concerned if it is true". and asserted that the 4-party opposition alliance does not believe in the politics of assassination and would do everything within the alliance's capacity to "resist" extra-constitutional politics of violence.

General Ershad said, "We are yet to be sure that the bombs planted in Kotalipara were genuine.... Don't blame others to cover up your failure (to contain anarchy)... none, not even the Prime Minister is safe now."

Ordinary citizens in Bangladesh feel no such reassurance and fear that the schedule of general election after automatic expiry of the Seventh Parliament may be interrupted by a proclamation of emergency. Vernacular newspapers have already reported that emergency as a possible option was being discussed at the top level of the ruling coterie. The comment to BBC by the Political Adviser to the Prime Minister, that even the members of the Prime Minister's that even the members of the Prime Minister's special security team are not above suspicion in the failed bombing attempt in Gopalgonj, has further fuelled speculations about more skeletons in the cupboard. If the purpose of ruling party response to the series of events as above was to cook up a "burning of the Reich" to beat the opposition, as opposition leaders suggest, it appears to have failed to cut the ice. If, on the other hand, the purpose was to create a public scare about the anarchy now ruling Bangladesh, the Prime Minister has certainly succeeded in owning up to her responsibility.

(Weekly Holiday : July 28, 2000)

www.pathagar.com

আওয়ামী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন-২
পত্র-পত্রিকার সম্পাদকীয়

প্রধানমন্ত্রীর অসংযত উচ্চারণ

১৯ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামে দলীয় নেতা-কর্মীদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকে নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা বলেন, চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ কি মরে গেছে যে রাজাকাররা আমাদের মেরে যাবে?

প্রধানমন্ত্রীর এ জিজ্ঞাসার সাথে এদেশের শান্তিকামী জনগণ একমত হয়ে বলবেন, না এ দেশের কোনো নাগরিককে খুন করার অধিকার শুধু রাজাকার কেন; প্রধান নির্বাহী অথবা প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে কারো থাকতে পারে না। অন্তত সভ্যদেশ সে কথাই বলবে। কিন্তু দেশের প্রধান নির্বাহী প্রধানমন্ত্রী যখন বলেন, 'আর যদি একটা লাশ পড়ে তবে ভবিষ্যতে ১০টা লাশ পড়বে।'

এখানেই প্রশ্ন? দেশের প্রধানমন্ত্রী কি এ কথা বলতে পারেন? কোনো সুস্থ মানুষ প্রধানমন্ত্রীর দেয়া এ আদেশকে সহজে গ্রহণ করতে পারেনি। সুস্থ মানুষ গ্রহণ করতে না পারলেও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা কতোটুকু গ্রহণ করেছেন? হয়ত এক অংশ বলেছেন, জয় প্রধানমন্ত্রীর জয়। অপর অংশ হয়ত ভেবেছেন, কাজটা ঠিক হয়নি। একইদিনে আরো একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজে। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতাসহ স্থানীয় নেতাদের নিয়ে এ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে পুলিশের তালিকাভুক্ত কয়েকজন সন্ত্রাসী উপস্থিত থাকায় এবং বৈঠকে বসার সুযোগ দেয়ায় পুলিশ কর্মকর্তা ও দলীয় নেতাদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন আওয়ামী লীগ নেতা বলেছেন, 'সন্ত্রাসীরা যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে তাতে ভবিষ্যতে রাজনীতি করার আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছি।'

তিনি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার কথা বলেছেন। কোথায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে? রাজনীতিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে কে? আওয়ামী নেতা না বললেও সচেতন মানুষের তা আর বুঝতে বাকি থাকে না। প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে যে সব সন্ত্রাসী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তারা হলো- আ জ ম নাসির উদ্দিন, মামুনুর রশীদ, হেলাল আকবর, বাবর, তাহের, দিদারুল আলম, মাসুম ও মহিমউদ্দিন।

এদিকে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার ফলে তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসীরা ভিআইপিতে পরিণত হবে।

চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে সংঘটিত ৮ খুনের কোনো আসামীকে পুলিশ এখনো গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি। গ্রেফতার করতে না পারার কারণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, আসামী ধরতে গিয়ে প্রয়োজনে গুলি চালাতে হলে চালান। কলকাতায় যেভাবে নকশালীদের দমন করা হয়েছে সেভাবে কাজ করুন।

www.pathagar.com

একদিকে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে আওয়ামী নেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলছেন, 'চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ কি শাড়ি-চুড়ি পরে বসে আছে, তিনি একটি লাশের বদলে দশটি লাশ দেখার কথা বলেছেন। পাশাপাশি পুলিশ প্রশাসনকে বলেছেন, প্রয়োজনে গুলি চালান। নকশালীদের দমন করার মতো এখানেও....।

শেখ হাসিনা পিতার কথা বলতে হয়তবা লজ্জা পেয়ে থাকতে পারেন। তাই উপমা হিসেবে কলকাতার কথা বলেছেন। শেখ মুজিব ১৯৭৩ সালে খুলনার এক জনসভায় একই ভাষায় কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'নকশাল দেখামাত্র গুলি কর।' নকশালের নামে '৭২-৭৫ সময়ের মাঝে পাখির মতো গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল ৪০ হাজার দেশপ্রেমিক ও আওয়ামী বিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীকে।

দৈনিক দিনকাল- ২১/৭/২০০০

প্রধানমন্ত্রীর অনভিপ্রেত উক্তি

হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচার করাই জরুরী

গত বুধবার চট্টগ্রাম সফরকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার দলের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে যেসব কথা বলেছেন তা কোনো নির্বাচিত সরকারের নির্বাহী প্রধানের মুখে উচ্চারণযোগ্য নয়। চট্টগ্রামের বহদ্দারহাটে সম্প্রতি জামায়াত-শিবির দলীয় বলে অভিযুক্ত একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসীর ব্রাশফায়ারে ছয়জন ছাত্রলীগ কর্মীসহ আটজন খুন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনা তার রুষ্ট প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, 'চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ কি মরে গেছে যে, রাজাকাররা আমাদের মেরে যাবে?' প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে বিস্ময়কর রকমের অসহিষ্ণুতার প্রকাশ ঘটেছে, যখন তিনি বলেন, 'আর যদি একটা লাশ পড়ে তবে ভবিষ্যতে ১০টা লাশ পড়বে।'

শেখ হাসিনা কি ভুলে গেছেন যে, জনগণ তাকে নির্বাচিত করেছে দেশ পরিচালনার জন্য? তিনি কি ভুলে গেছেন যে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর পরিচয়ের চেয়ে তার বড় পরিচয় তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী? যদি ভুয়ে গিয়ে থাকেন তবে তার হিতৈষীদের এখন তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া জরুরী কর্তব্য যে, প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে কার্যরত অবস্থায় তিনি এমন উক্তি করেছেন যা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোনো ব্যক্তিই বলতে পারেন না।

বহদ্দারহাটে আট যুবকের হত্যাকান্ডের বিচারের জন্য দেশে আইন রয়েছে, আইন প্রয়োগের জন্য সরকার আছে, যে সরকারের প্রধান স্বয়ং শেখ হাসিনা এবং সে সরকারের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা রয়েছে। তাহলে লাশের বদলে লাশ ফেলার হুমকি কেন? এবং কেন তা স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর মুখে?

এর অর্থ কি এই নয় যে, এই সরকার আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে বলে যে আত্মতৃপ্তিপূর্ণ প্রচারণা চালায় তা অন্তঃসারশূন্য বুলি মাত্র? এর অর্থ কি এই নয় যে, এই সরকার তার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যথাযথ দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করতে পারেনি? এর অর্থ অনেকাংশেই এ রকম যে অন্তত পক্ষে আইনশৃংখলা প্রশ্নে এই সরকার ব্যর্থ।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনার এহেন উক্তি ও হুমকি উচ্চারণ অনভিপ্রেত-এতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং আওয়ামী লীগের সভানেত্রী হিসেবেও তিনি এমন হুমকি বা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করতে পারেন না- এটা রীতিমতো এক অগণতান্ত্রিক হঠকারী, নৈরাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচায়ক। এটা দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করতে এবং অরাজনৈতিক, সহিংস পথে নিয়ে যেতে পারে। নাগরিক সাধারণের পক্ষে এটা উদ্বেগজনক।

বহদ্দারহাটের হত্যাকাণ্ড অবশ্যই নিন্দনীয়, শাস্তিযোগ্য বিরাট এক অপরাধ। এই অপরাধের সঙ্গে জড়িতদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গ্রেপ্তার করে বিচারের কাঠগড়ায় হাজির করতে পারার মধ্যেই রয়েছে সরকারের যোগ্যতা ও কৃতিত্বের পরিচয়। শেখ হাসিনা তার দলের নেতা-কর্মীদের উত্তেজিত করার পরিবর্তে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে স্বাভাবিক মাত্রায় কার্যকর করার কাজে মনোযোগী হলেই মঙ্গল হবে।

প্রথম আলো ২১/৭/২০০০

প্রধানমন্ত্রীর বেআইনী বক্তব্য

চট্টগ্রামের হত্যাকান্ডকে উপলক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে ধরনের কথাবার্তা বলছেন তাতে মানুষের মধ্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সরাসরি পুলিশকে এমন কথা বলতে কি করে পারেন যে, অপরাধী ধরতে গিয়ে ২/৪টা লাশ পড়ে গেলেও কোন অপরাধ হবে না? প্রধানমন্ত্রী একথাও বলতে দ্বিধা করেননি, আপনারা ব্যর্থ হলে দল ব্যবস্থা নেবে। তারা অস্ত্র হাতে নিতে বাধ্য হবে।

চট্টগ্রামের এই মার্ডারের কোন অপরাধীই এখন পর্যন্ত গ্রেফতার হয়নি। এমতাবস্থায় কোন একটি রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী ও ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্রশিবিরকে টার্গেট করে দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রকারান্তরে যে ধরনের এ্যাকশানের নির্দেশ দিয়ে এলেন তা আইন বিরোধী ও অতিশয় প্রতিহিংসমূলক। প্রধানমন্ত্রীর পদে বসে এ ধরনের কথা বলা যায় না। আমরা আশা করেছিলাম প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রাম গিয়ে পুলিশী এ্যাকশানে এবং ছাত্রলীগের প্রতিশোধাত্মক হামলায় আতংকগ্রস্ত মানুষদের আশ্বস্ত করবেন। কিন্তু তিনি তা না করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ জামায়াত ও শিবিরের বিরুদ্ধে পুলিশ ও তার দলীয় কর্মীদের কি নির্দেশ দিয়ে এলেন?

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি ও ধর্মীয় আদর্শের মূল উৎপাটনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য নিয়ে সরকার চট্টগ্রামের ৮ খুনের ঘটনাকে অসিলা করেছে।

জামায়াতে ইসলামী ও শিবিরের ওপর এই হামলা এদেশের স্বাধীনতা সচেতন প্রতিটি রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং ভবিষ্যৎদ্রষ্টাগণ পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন। সরকার যাই করুন এবং বলুন বিরোধী দলের অর্থবহ শরীক হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর উচিত সরকারের উদ্দেশ্যমূলক প্রতিটি এ্যাকশন, জুলুম নিপীড়নে ধৈর্যধারণ করা এবং চার দলীয় ঐক্যের কর্মসূচীর ওপর অটল এবং অবিচল থাকা।

www.pathagar.com

আইনের শাসন যার হাতে সেই প্রধানমন্ত্রীর চট্টগ্রামে দেয়া বেআইনী বক্তব্য অবশ্যই সব মানুষের দ্বারা নিন্দিত হবে। তিনি একটি নির্বাচিত সরকারের প্রধান হয়ে এ ধরনের কথাবার্তা বলতে পারেন না। তার মুখে প্রতিপক্ষের প্রতি প্রমাণহীন দোষারোপ শোভা পায় কি? তার কথার প্রভাব তার দলের ওপর এবং পুলিশ প্রশাসনে অন্যভাবেও তো পড়তে পারে। প্রধানমন্ত্রীর এই বেআইনী বক্তব্য আইন ভঙ্গকারীদের আরও উৎসাহিত এবং আইন-শৃংখলার অগ্রগতিকে আরও বিপজ্জনক করে তুলতে পারে।

দৈনিক সংগ্রাম- ২২/৭/২০০০

চট্টগ্রাম পরিস্থিতি

চট্টগ্রাম পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে উঠছে। একদল আততায়ীর হাতে শাসক দলীয় ৬ জন ক্যাডারসহ ৮ জন নিহত হবার পর থেকে বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামের পরিবেশ হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক। ওই হত্যাকাণ্ড নিয়ে সরকারের 'রাজনৈতিক খেলা' বিষয়টিকে করে তুলেছে জটিল। প্রকৃত অপরাধীদের পুলিশ এখনো ধরতে পারেনি। তবে দৌড়-ঝাঁপ চলছে পুরোদমেই।

হত্যাকান্ডের পর ১১ দিন গত হলেও পুলিশ কোনো কিনারা করতে পারেনি। যদিও শাসক মহল থেকে বার বার একটি রাজনৈতিক দলের ছাত্রফ্রন্টকে এই হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী করা হচ্ছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একই কথা বলেছেন। আর তাদের বক্তব্যের সাথে চট্টগ্রাম পুলিশের কর্মকাণ্ডেও দেখা যাচ্ছে চমৎকার মিল। স্থানীয় পুলিশ ওই ৮ খুনের ঘটনায় গ্রেফতার করেছে চট্টগ্রামের শিবির কর্মীদের। ফলে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, ৮ খুনের ঘটনার সুষ্ঠু ও সঠিক তদন্ত শেষ পর্যন্ত হবে কি-না।

গতকাল দৈনিক দিনকালসহ একাধিক পত্রিকায় চট্টগ্রাম হত্যাকান্ড সম্পর্কে যে সর্বশেষ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ওই মর্মান্তিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরকারের রাজনৈতিক দাবা খেলার বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়েছে। একটি মাইক্রোবাসে করে এসে সন্ত্রাসীরা হত্যাকান্ড ঘটালেও মামলা করা হয়েছে ৩৫ জনকে আসামী করে। পরবর্তীতে আসামীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ৫০ জনে। প্রশ্ন উঠেছে, এরা সবাই কি হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছে? যদি তাই হয় তাহলে ওই মাইক্রোবাসের ধারণক্ষমতা কতো?

অপর একটি দৈনিকের খবরে বলা হয়েছে- চট্টগ্রাম নগরবাসীর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি পুলিশী আতংক বিরাজ করছে। পুলিশ সেখানে খুনীদের ধরার নামে গণহারে গ্রেফতার করছে। অনেককে আটক করে নানাভাবে হয়রানিও করা হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আবার ৮ হত্যার সাথে জড়িয়ে দেবার ভয় দেখিয়ে বিভিন্ন জনের কাছ থেকে পুলিশের একটি অংশ অর্থ আদায় করছে বলেও জানা গেছে। আইন-শৃংখলা রক্ষায় নিজের ব্যর্থতা ঢাকা দিতে পুলিশ এখন আসামী ধরার নামে চট্টগ্রামে তোলপাড় কাণ্ড চালাচ্ছে।

মূলত চট্টগ্রামের ৮ খুনের মামলাটির পরিণতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় এটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। কেননা, এ যাবৎ দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের কথাবার্তা এবং পুলিশের

www.pathagar.com

ভূমিকায় একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রকৃত খুনীদের গ্রেফতার নয়, বরং ওই ঘটনাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটাই সরকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। ফলে শেষ পর্যন্ত মামলাটিকে হয়তো মৃত্যুবরণ করতে হবে।

একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, একটি মর্মান্তিক হত্যাকান্ডকে রাজনৈতিক পুঁজি বানাতে গিয়ে সরকার বিষয়টিকে ঘোলাটে করে তুলেছে। রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করতে এর চেয়েও জঘন্য পন্থা অবলম্বনের নজির অবশ্য আওয়ামী লীগের আছে। ফলে শাসক দলের ন্যক্কারজনক খেলার কারণে ৮ খুনের মামলাটির যদি অপমৃত্যু ঘটে তাহলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

দৈনিক দিনকাল- ২৩/৭/২০০০

'প্লিজ স্টপ টু টক ননসেন্স'

দেশের শীর্ষস্থানীয় একটি দৈনিকে একটি উদ্বেগজনক সংবাদ প্রকাশ পেয়েছে। প্রকাশিত ওই সংবাদে বলা হয়েছে, চট্টগ্রামের বহদ্দারহাট হত্যাকান্ডের ১০ দিন পরেও এখন নগরবাসীর মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার পাশাপাশি পুলিশী আতংক বিরাজ করছে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় চিহ্নিত আসামী ধরার নামে কথিত পুলিশের বাড়াবাড়ি ধরনের তৎপরতা এখন প্রায় সর্বত্র আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে ৮ খুনকে কেন্দ্র করে পুলিশের বেপরোয়া ধরপাকড়ে চট্টগ্রামের জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আইনের সেবক (?) পুলিশ নিরপরাধ লোককে ধরার যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। খবরে বলা হয়েছে, প্রকৃত খুনীদের কেশাগ্র পুলিশ এখনও স্পর্শ করতে পারেনি। তবে পুলিশের ভাষায় জামায়াত-শিবিরকে ব্যাপকভাবে গ্রেফতার ও আটক করা হচ্ছে। নিরীহ নাগরিকও বাদ যাচ্ছে না। সরকারের উচ্চ মহলকে খুশি করার জন্য পুলিশ সাহেবরা এ কাজটি করছেন। যা জনগণের কাছে পছন্দনীয় নয় এবং চরম বিরক্তিকর। যা আইন বিরুদ্ধ, চরম বেআইনি, সংবিধান বিরোধী। তবে বর্তমান সরকার বাহাদুরের কাছে এটি বোধ হয় খুবই পছন্দনীয়। এর প্রমাণ পাওয়া যায় প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং পানিমন্ত্রীর বক্তব্যে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াত-শিবিরকে প্রতিরোধ করুন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার স্বভাবসুলভ 'হাম্বিতম্বি' আচরণ অক্ষুণ্ন রেখে বলেছেন, জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে ব্যাপক পদক্ষেপ নেবো। পুলিশকে তিনি নির্দেশ দিয়েছে গ্রেফতারের। সবচেয়ে ভাল বলেছেন, প্রবীণ রাজনীতিবিদ, সাবেক বাকশাল নেতা, বর্তমান আওয়ামী লীগের পানিমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেছেন, কোন নির্দেশের প্রয়োজন নেই, জামায়াত-শিবিরকে যেখানে দেখবেন, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ুন। প্রধানমন্ত্রী এবং সম্মানিত মন্ত্রীবর্গ দেশের সংবিধান ও আইনের রক্ষক। সংবিধান ও আইন রক্ষায় শপথ নিয়েই তারা মন্ত্রী হন। তারাই যদি আইনকে জনগণের হাতে তুলে দেন, তাহলে দেশের স্থিতিশীলতা থাকবে কি করে? এমনিতেই সরকারের ব্যাপক প্রশাসনিক দলীয়করণের মুখে দেশে এক ভয়াবহ

www.pathagar.com

পরিস্থিতি বিরাজ করছে। প্রতিদিন ডজনকে ডজন খুন হচ্ছে। সরকারের দোদুল্যমানতার সুযোগে পুলিশের 'চেইন অব কমান্ড' ভেঙ্গে পড়েছে। চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ হুমকি দিয়েছে, ৮ খুনের বিচার না হলে লাশের স্তূপ পড়বে। এমনি ধরনের উত্তেজনাকর বক্তব্যের মাঝখানে ঘি ঢেলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীরা। অর্থাৎ জামায়াত শিবিরকে পেলেই প্রতিরোধ করুন।

দৈনিক জনতা ২৩/৭/২০০০

'জাজমেন্ট বিফোর ট্রায়াল'

চট্টগ্রামে ৮ খুনের ঘটনার পর প্রকৃত খুনী ও সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের পরিবর্তে দেশ জুড়ে জামায়াত-শিবির বিরোধী অভিযান শুরু হয়েছে। সরকারের কর্মকাণ্ডে খোদ আওয়ামী লীগের মধ্যেই প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। জামায়াত-শিবির বিরোধী প্রচারণা ও দমনমূলক তৎপরতার উদ্দেশ্যে এবং এর দীর্ঘ মেয়াদী প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নিয়ে দলের কোন পর্যায়ে আলোচনা না করেই এ্যাকশন নেয়ার বিষয়টিও দলে সমালোচিত হচ্ছে। এ সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট একটি শীর্ষ স্থানীয় জাতীয় দৈনিকে প্রকাশিত হয়েছে।

চট্টগ্রামের বহদ্দার হাটে ছাত্রলীগের ক্যাডারসহ ৮ জন নিহত হওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক। দেশের প্রতিটি সচেতন মানুষ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়েছে। দেশবাসী চায় যে কোন হত্যা ঘটনার সাথে জড়িতরা শাস্তি পাক এবং প্রকৃত খুনীরাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সম্মুখীন হোক। কিন্তু দেশ ও জাতি অত্যন্ত উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছে যে, কোন হত্যাকান্ড ঘটলেই সরকারের দায়িত্বশীল মন্ত্রী, শীর্ষ স্থানীয় নেতারা ঘরে বসেই বলে দেন অমুক খুন করেছে। মনে হবে হত্যাকারীরা ঘটনা সংঘটিত করার আগেই টেলিফোনে তাদের অবহিত করে থাকবেন। যে কোন খুন হলেই সরকার বলে এটি জাতীয় পার্টি, বিএনপি অথবা জামায়াত শিবির করেছে। সরকারের প্রধানমন্ত্রী একইভাবে লাগামহীন বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন। ফলে দেশে এক চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির ১৭৯ জন সদস্য গত মঙ্গলবার এক যুক্ত বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যকে জাজমেন্ট বিফোর ট্রায়াল বা বিচারের আগেই রায়ের সমতুল্য মন্তব্য করে বলেছেন, এ ধরনের লাগামহীন উক্তি জাতির জন্যে কল্যাণকর নয়। বিবৃতিদাতা আইনজীবীগণ বলেন, যে কোন ঘটনার তদন্তকালে কোন রাজনৈতিক সংগঠনকে অভিযুক্ত করে রাষ্ট্রীয় কর্ণধারদের দায়িত্বহীন বক্তব্য নিরপেক্ষ তদন্ত কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির নামান্তর। এতে তদন্ত প্রভাবিত ও প্রকৃত খুনীদের আড়াল করা হয়।

আমরা লক্ষ্য করছি যে কোন ঘটনার সাথে সরকার তাদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে জড়িয়ে ফেলেন। ফলে পুলিশের তদন্ত কাজ প্রভাবিত হয়। কেননা তারাতো সরকারি চাকুরে। যখন প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একটি পক্ষ নিয়ে কথা বলেন, তখন তদন্তকারী কর্মকর্তা দো টানায় পড়ে যান। আর স্বাভাবিক গতি ব্যাহত হয়। হত্যাকারীদের কোন দল নেই, কোন মত নেই,

www.pathagar.com

পথ নেই, ওরা হত্যাকারী। তদন্ত সাপেক্ষে প্রকৃত খুনীদেরকেই আইনের হাতে সোপর্দ করতে হবে। আদালতের রায়ই বলে দেবে কে খুনী কে বা দোষী। এদিকে সরকারকে খুশি করতে গিয়ে পুলিশ ঢালাওভাবে চট্টগ্রামে বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের ওপর উৎপীড়ন ও নিপীড়ন চালাচ্ছে। নির্দোশ যুবকদের গ্রেফতার করে বাহাদুরী দেখানোর মিথ্যা চেষ্টা করছে। এদিকে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, পুলিশের এ নাটকীয়তায় প্রকৃত খুনীরা গা ঢাকা দিয়েছে। যা হচ্ছে তা আইওয়াশ মাত্র। এদিকে প্রাপ্ত তথ্যে প্রকাশ, চট্টগ্রামে ৮ খুনের ঘটনা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলেও চট্টগ্রামে গত এক মাসে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনায় কমপক্ষে ১০ জন আওয়ামী লীগ ও তার অঙ্গ সংগঠনের নেতা ও কর্মী খুন হয়েছে। যার বেশিরভাগ আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফল। ধারাবাহিক খুনের ঘটনা ঘটলেও এর কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অন্যদিকে ব্রাশফায়ারে ৮ খুনের ঘটনার ৭ দিন পরও খুনীদের কেশাগ্র ছুঁতে পারেনি পুলিশ–শুধু বিরোধীদলের নেতাদের হুমকি-ধমকি দেয়া হয়েছে। দেশের অন্যান্য স্থানের মত চট্টগ্রামেও অব্যাহতভাবে সন্ত্রাস হচ্ছে। হত্যা-সন্ত্রাস বন্দরনগরীর জন্যে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারী প্রশাসন এ পর্যন্ত কোন হত্যাকান্ডেরই সুরাহা করতে পারেনি। কেননা সন্ত্রাসী ও হত্যাকারীদের পেছনে যারা মদদ দেন, তাদের বেশির ভাগই সরকারি দলের প্রভাবশালী নেতা। পুলিশ সঙ্গত কারণেই মামলা নিয়ে এগুতে পারে না। নিহত আওয়ামী ক্যাডাররা এবং খুনীরা যে দুটি গাড়ি ব্যবহার করেছিল, সে গাড়িগুলোর সঠিক তথ্য এখনও রহস্যাবৃত। সবকিছু বাদ দিয়ে সরকার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকেই ঘায়েল করতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু এভাবে তো দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল হবে না, বরং সন্ত্রাস আরো বাড়বে বৈ কমবে না।

দৈনিক জনতা- ২১/৭/২০০০

We all must listen to PM: Wear bangles and sarees

While rebuking police for their alleged failure to nab the real killers of eight persons, the PM told police that she was restraining BCL workers from taking up arms "to protect themselves. Don't force us to take this decision. This statement neither befits a leader nor specially the Prime Minister. Her statement on police administration is again partisan.

Everybody knows that police have no freedom to arrest the politically protected criminals. The Prime Ministers had made it clear when she said she was restraining her BCL activists from taking arms against their alleged killers. What she said in effect was that BCL killers would be protected she being the Prime Ministers.

www.pathagar.com

Some 118 lawyers of the Supreme Court have exactly underlined this point when they asserted that the Prime Minister and the Home Minister would have to bear the consequences of their irresponsible statements. They referred to killings of three persons in Fatikchhari of Chittagong after the PM made similar statement that encouraged armed attack on these persons.

It is indeed a direct incitement to party workers to act when the PM asked whether her party men in Chittagong were wearing bangles and sarees and could not resist the miscreants.

Those who are not resisting wrong and illegalities in the country must take PM's advice and were bangles and sarees.

What Sheikh Hasina should have realized before she made the statement is that she represents everybody in Bangladesh as PM. She is not only a head of a political party. Her actions and statements have to be responsible and assuring to the people. It is not safe to provoke killing and protect killers even when they belong to her political party. (The New Nation : July 22, 2000)

Misfortune for Rule of Law

The Prime Minister has been quoted in reports published by some prominent Bangla Dailies as saying that for one more dead body there would be ten (on the other side). If others could take up arms, why can't you, seemed to be the vein she took. It defies our understanding as to how she could bring herself to accept the presence of some listed terrorists among BCL cadres at the review meeting she held with the police!

The PM's utterances in Chittagong are essentially illustrative for her failure to distinguish between her role as Prime Minister of the country and that as the chief of Awami League Party. Her velvet-glove approach to the criminal elements in her party coupled with the call for reprisals she has apparently issued in Chittagong are not the stuff of which good governance is made.

Her language and attitude as exemplified in Chittagong cannot be conducive to the rule of law. Rather they read like an invitation to slanging matches we can and must do without. Her position as Prime Minister is too sacrosanct for such things. She has to realise that. (The Daily Star: July 21, 2000)

www.pathagar.com

Signal for Witch-hunt

Prime Minister Sheikh Hasina has in effect called upon her people to take law in their own hands by declaring in Chittagong on July 19, "time has come now to retaliate and resist" opposition "conspirators trying to grab power," labelled by her also as "killers of 1971 and 1975" and as "razakars" who, she said, were "firmly and deeply rooted" in society.

The student-power gangwars in Chittagong is certainly not one-sided, and much of it arose from factional battles within the ruling party student wing that has been going on therefore quite some time.

Evidently, the much-vaunted anti-terrorists drive of the Home Minister in the South-Western region and elsewhere in the country has failed. And a devastating reminder of the long hand of terror has come by the brutal murder of the noted journalist Shamsur Rahman of Jessore, who had taken upon himself the task of carrying on an unarmed crusade in newspaper columns against smuggling gang and terrorists underground.

A bit of a candid expression of her failure in government frankly came out in her remark in the parliament, in similar vein as her late father used to say, that she was surrounded by ministers, partymen and relations who and whose dependents committed crimes, and she had to take the blame, while the administration was disobeying her dictates.

Fresh in public memory are also the ruling party terror campaign against the judiciary, and the impediments to criminal investigations that are being posed by the ruling party itself in, for instance, the Shipu murder case and the Bushra murder case in which ruling party bigwigs are clearly involved. No wonder the anti-terrorist proclamations of both the Prime Minister and the Home Minister are falling flat in the ears of the public.

(The Weekly Holiday: July 21, 2000)

www.pathagar.com

আওয়ামী ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন-৩

পত্র-পত্রিকার উপ-সম্পাদকীয়

চট্টগ্রাম হত্যাকান্ড ঃ পূর্বাপর ঘটনা পরম্পরা ঃ

বক্তৃতায় আগুনের হল্কা ঃ ঈশান কোণে কালো মেঘ

গত ১৪ জুলাই (শুক্রবার) দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত একটি খবর পড়ে অনেকে চমকে ওঠেন। খবরটি নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অফিস-আদালত, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং টেলিফোন সংলাপে ঐ সংবাদটি প্রাধান্য পায়। পাঠক ভাই-বোনের সুবিধার জন্য সংবাদটি নীচে হুবহু তুলে ধরছি। সংবাদটির শিরোনাম ছিল "৮টি হত্যাকান্ডের ব্যাপারে একটি সংগঠনের দায়-দায়িত্ব স্বীকার।" সংবাদে বলা হয়েছে, "জাতীয় বিপ্লবী কাউন্সিল বাংলাদেশ" নামে একটি সংগঠন গত বুধবার খাজা রোড এলাকায় ব্রাশ ফায়ার করিয়া ৮টি হত্যাকান্ডের দায়িত্ব স্বীকার করিয়া প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। জাতীয় বিপ্লবী কাউন্সিলের কমান্ডার ইন চীফ নামে অস্পষ্ট স্বাক্ষরে প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, জাতীয় বিপ্লবী কাউন্সিলের পক্ষ হইতে প্রথম ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদন্ডের প্রতীক হিসেবে ইহা কার্যকর হইয়াছে। সাদা কাগজে টাইপ করা এবং ১২ই জুলাই তারিখে স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অদূর ভবিষ্যতের জন্য আমরা দেশ ও জাতির স্বার্থে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছি। ভবিষ্যতে ব্যাপক কর্মসূচীর মধ্যে থাকবে দেশের সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের লাগামহীন চাঁদাবাজি ও হয়রানি বন্ধে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড এবং দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী নির্মূল অভিযান। এ ব্যাপারে আমরা রাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তি হইতে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ কামনা করিতেছি। সরকার বা প্রতিপক্ষ কোনো কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া কোনো সুফল আশা করতে পারবে না। আমরা এলটিটিই হইতেও ভয়ানকরূপে আবির্ভাব হইব।' দৈনিক 'ইত্তেফাকের' এই খবরে বলা হয়েছে যে খবরটি সাদা কাগজে টাইপ করা এবং ১২ জুলাই-এ স্বাক্ষর করা। এটা হলো চট্টগ্রাম ৮ ব্যক্তিকে হত্যা করার পরের খবর।

চট্টগ্রামে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীসহ ৮ ব্যক্তির হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ১২ জুলাই (বুধবার)। এর আগের দিন অর্থাৎ ১১ জুলাই (মঙ্গলবার) ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আরেকটি খবর খুব ফলাও করে প্রকাশিত হয়। দৈনিক ভোরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম জুড়ে প্রকাশিত এই সংবাদের হেডিং ছিল, "ফটিকছড়িতে ৩ ক্যাডারকে গুলি করে হত্যা, ২ ঘন্টা বন্দুক যুদ্ধ/টিপু বাহিনী-তৈয়ব বাহিনীর সংঘাত।" এই খবরটি পড়েও পাঠক চমকে উঠেছিলেন। পরদিন চট্টগ্রামে যখন আরো ৮ জন খুন হলো তখন মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়ে। অনেক সচেতন এবং বোদ্ধা পাঠকের মনে অনেক প্রশ্ন ভিড় করে তাদের মনে অনেক ভাবনা ঃ আগের দিন ৩ জন খুন, পরের দিন ৮ জন খুন। পাঠকের স্মৃতি জাগ্রত করার জন্য দৈনিক ভোরের কাগজে' প্রকাশিত ঐ খবরটি হুবহু তুলে দিলাম, জেলার ফটিকছড়ি ধানাধীন কাঞ্চন নগর পাহাড়ি এলাকায়, গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে ছাত্র লীগ নামধারী এক গ্রুপের সন্ত্রাসীদের

www.pathagar.com

গুলিতে অপর গ্রুপের ৩ জন নিহত ও কমপক্ষে ৫ জন আহত হয়েছে। বেলা আনুমানিক ২টার দিকে গোলাগুলি শুরু ও ৩ জন নিহত হওয়ার পর সন্ত্রাসী দুই গ্রুপের মধ্যে প্রায় ২ ঘন্টাব্যাপী থেমে থেমে কমপক্ষে শতাধিক রাউণ্ড গুলি বিনিময় হয়েছে বলে জানা গেছে। এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে সাপে-নেউলে দ্বন্দ্বে লিপ্ত টিপু বাহিনী ও তৈয়ব বাহিনীর মধ্যে এই প্রাণঘাতি বন্দুকযুদ্ধ সংঘটিত হয়। জেলা পুলিশ সুপার ইফতেখার উদ্দিন জানান, তৈয়ব গ্রুপের কয়েকজন ক্যাডার মোটর সাইকেলে করে কাঞ্চন নগর ইউনিয়নের একটি চা বাগানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা ঘাতকদের গুলিতে ৩ জন নিহত হয়েছে। পুলিশ সুপার ৩ জনের খুন হওয়ার কথা জানালেও ২ জনের নাম জানতে পেরেছেন। এরা হলো খোরশেদ এবং আলম। তবে পুলিশ সুপার দুই গ্রুপের বন্দুকযুদ্ধের কথা অস্বীকার করেন। এদিকে অন্য একটি সূত্র মতে, ওরা জনৈক ছাত্রনেতা এয়াকুবের পিতার জানাযায় অংশ নিতে যাওয়ার সময় টিপু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা গুলি করে এদেরকে হত্যা করে। তবে এলাকাবাসী ও জেলা পুলিশের অপর একটি সূত্র জানিয়েছে, ৩ জন নিহত হওয়ার পর তৈয়ব গ্রুপ ও টিপু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের মধ্যে পাহাড়ি এলাকায় প্রায় ২ ঘন্টাব্যাপী বন্দুকযুদ্ধ হয়। এ লড়াইয়ে ৫ জন আহত হয়। তবে তাদের নাম-পরিচয় জানা যায়নি। সহযোগী সন্ত্রাসীরা আহতদেরকে গোপন স্থানে সরিয়ে নিয়ে গেছে বলেও জানা গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, এএসপি সার্কেল ও ফটিকছড়ি থানার ওসিসহ বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঘটনাস্থলে যান। কিন্তু রাত ৯টা পর্যন্ত ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করার সংবাদ জানা যায়নি। পুলিশ দুইটি মোটর সাইকেল উদ্ধার করেছে। গতকাল রাতেই তিনটি লাশ ফটিকছড়ি থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। আজ বুধবার লাশ ময়না তদন্তের জন্য চট্টগ্রাম শহরে আনা হবে বলে জানা গেছে। জেলা পুলিশ সুপার বলেছেন, 'কারা এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িত তাদেরকে আমরা চিনি এবং ধরার চেষ্টা করছি।'

গতকালের এই ঘটনার পর ফটিকছড়িতে অত্যন্ত থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। আবারো যেকোনো সময় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ বেধে যেতে পারে বলে আশংকা করছে পুলিশ ও ফটিকছড়িবাসী। উল্লেখ্য, গত বছর তৈয়ব বাহিনীর গুলিতে টিপু বাহিনী প্রধান টিপু নিহত হওয়ার পর সন্ত্রাসীরা এলাকার দুই অংশে নিজেদের সুদৃঢ় ঘাঁটি গড়ে তুলেছে। ইতিমধ্যে তারা বহুবার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং বেশ ক'জনের প্রাণহানি ঘটেছে।"

এর পরদিন ১২ জুলাই সেই নৃশংস হত্যাকান্ডটি ঘটলো, কে বা কারা ঘটিয়েছে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড সেটা তাৎক্ষণিকভাবে বলা সম্ভব নয়। কারণ কোনো আনুষ্ঠানিক তদন্ত হয়নি। বিচার বিভাগীয় তদন্ত তো দূরের কথা কোনো নির্বাহী তদন্তও হয়নি। তাহলে সরকারের সবচেয়ে শীর্ষবিন্দু থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, পুলিশের আইজি, ডিআইজি প্রমুখ রাঘব বোয়ালরা ঢালাওভাবে বলেছেন যে, এটা হলো জামায়াত ও শিবিরের কাজ। সরকারী তথ্য মাধ্যমে এবং খোদ প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে ছাত্রলীগের নেতারা পর্যন্ত যখন জামায়াত-শিবির এবং জাতীয়তাবাদীদের ওপর ঢালাও আক্রমণ করছেন তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ

www.pathagar.com

নাসিম জামায়াতে ইসলামী এবং ছাত্রশিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী করেছেন। ঠিক এমন একটি পটভূমিতে গত ১৪ জুলাই (শুক্রবার) দৈনিক প্রথম আলোর প্রথম পৃষ্ঠায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সংবাদটির শিরোনাম হলো কে এই সাজ্জাদ?' ৮ ব্যক্তির হত্যা রহস্য উদঘাটনে এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। পাঠক-পাঠিকা ভাই-বোনদের সুবিধার জন্য আমরা সেই খবরটি হুবহু নীচে তুলে ধরলাম, 'বন্দরনগরী চট্টগ্রামের অপরাধ জগতে সাজ্জাদ নামে নতুন এক সন্ত্রাসী আবির্ভূত হয়েছে। সন্দেহ করা হচ্ছে, গত বুধবার বহদ্দারহাট বহদ্দারবাড়ী মোড়ে ৬ জন ছাত্রলীগ নেতাসহ ৮ জনকে ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করেছে সাজ্জাদ ও তার অনুসারীরাই। চাঞ্চল্যকর এ হত্যা মামলার দুই নম্বর আসামী করা হয়েছে সাজ্জাদকে। এর আগেই সে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও ওয়ার্ড কমিশনার লিয়াকত আলী খান হত্যা মামলার চার্জশীটভুক্ত আসামী। আবার ২৩ দিন আগে বিএনপি'র চট্টগ্রাম অফিসে হানা দিয়ে অস্ত্রের মুখে তাদের দলীয় নেতা শাহ আলমকে অপহরণ করে নিয়ে এসেছিল সে। একের পর এক সব সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িয়ে পড়া এই সাজ্জাদ কে? চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ প্রশাসনের গোয়েন্দা শাখার এক অফিসার সাজ্জাদের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বর্ণনা দিয়ে প্রথম আলোকে বলেন, সে হলো এক দুর্ধর্ষ গান ফাইটার (বন্দুকযোদ্ধা)। এক বছর ধরে চেষ্টা করেও সাংঘাতিক ধূর্ত এ সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। অথচ মাঝারি গড়নের ফর্সা এ যুবককে এক হাজার মানুষের মধ্যেও সহজেই শনাক্ত করা সম্ভব। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই গোয়েন্দা অফিসার আরো জানান, দু'বছর আগে শিবিরের ক্যাডার ও পুলিশের তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী খুকুমনি হত্যাকান্ডের পর থেকে সাজ্জাদ লাইমলাইটে চলে এসেছিল। কমিশনার লিয়াকত আলী খানকে হত্যার পর সাজ্জাদ ভারতে আত্মগোপন করে। কয়েক মাস পর দেশে ফিরে এসে আবারও অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। সাংঘাতিক রকম একরোখা স্বভাব তার। পুলিশ সূত্র জানায়, সাজ্জাদের নামে মোট ৬টি মামলা রয়েছে। তার অপরাধের ধরন পর্যালোচনা করে মহানগর পুলিশ প্রশাসন গত বছর শীর্ষ সন্ত্রাসীদের তালিকায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করেছে। কমিশনার লিয়াকত আলী খান হত্যা মামলার চার্জশীটভুক্ত আসামী ধনাঢ্য ঠিকাদার গনি কন্ট্রাক্টরের কনিষ্ঠ সন্তান হলো সাজ্জাদ। এই সম্পর্কে ছাত্র শিবিরের চট্টগ্রাম মহানগর কমিটির সভাপতি মেজবাহুল কবিরকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি শিবিরের সঙ্গে সাজ্জাদের সংশ্লিষ্টতার কথা অস্বীকার করে বলেন, আমরা তাকে প্রশ্রয় দেই না। রাজনৈতিক একটি সূত্র জানায়, গত বুধবারের ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছে হাবিব খান ও সাজ্জাদ। তাদের সঙ্গে ছিল সোলেমান, আনোয়ার ল্যাঙ্গানাজিম। অত্যাধুনিক একে-৪৭ রাইফেল দিয়ে তারা ব্রাশ ফায়ার করেছে। ঘটনাস্থল থেকে একে-৪৭ রাইফেল ব্যবহৃত গুলীর কয়েকটি খোসা উদ্ধার হয়েছে বলে জানান চট্টগ্রামের পুলিশ কমিশনার এ টি আহমেদুল হক চৌধুরী। নগরীর প্যারেড কর্ণারের টাকশাল মাজার মহসিন কলেজের পেছনের বস্তি ও শুল্ক বহর পুরাতন বাহারউল্লা মসজিদের গলির ভেতরে ওই সন্ত্রাসীরা নিয়মিত আড্ডা দেয়। হাবিব খানও একসময় ছাত্রদল করত বলে ছাত্রদলের একজন নেতা জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

॥ দুই ॥

আজকের এই কলামে উদ্ধৃতি খুব বেশী হয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে আমি সচেতন। তবু আমি নাচার। চট্টগ্রামে পর পর দু'দিন নৃশংস হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে। প্রথম দিনে ৩ জন খুন হয়েছে। পরদিন ৮ জন। দুই দিনে খুন হয়েছে ১১ জন। প্রায় সব কাগজেই লেখা হয়েছে যে, প্রথম দিন ছাত্র লীগের একটি গ্রুপ আরেকটি গ্রুপের ৩ জনকে হত্যা করেছে। এই হত্যাকান্ডটি নৃশংস। ৮ জনের হত্যাকান্ড অবশ্যই নৃশংস। দুইটি হত্যাকান্ডেরই বিচার হওয়া উচিত এবং হত্যাকারীদেরকে আইন মোতাবেক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া উচিত। এজন্য সবচেয়ে আগে যেটা প্রয়োজন সেটা হলো উভয় হত্যাকান্ডের নিরপেক্ষ তদন্ত অনুষ্ঠান। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে, প্রথম হত্যাকান্ড অর্থাৎ ১১ জুলাই মঙ্গলবারের হত্যাকান্ডটি চাপা পড়ার উপক্রম হয়েছে। দ্বিতীয় হত্যাকান্ডটির অপরাধীর পরিচয় এখনও অজ্ঞাত। সমগ্র দেশবাসীর দাবী, অপরাধীদের খুঁজে বের করা হোক, তাদের অপরাধ প্রমাণ করা হোক এবং তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া হোক। সেগুলো করতে হলে আগে তো তদন্ত করতে হবে এবং অপরাধীদের অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে হবে। সেই কাজটি না করেই এখন প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অপরাধীদেরকে সনাক্ত করে ফেলেছেন এবং তাদেরকে আঘাত করার জন্য পুলিশকে কঠোর নির্দেশ দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, "রাজাকাররা বড় বাড় বেড়েছে, এই হত্যাকান্ডের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, আমরা আর পড়ে পড়ে মার খাবো না।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এ ব্যাপারে চরম কথা বলেছেন। তিনি যা বলেছেন তারপর আর কোনো কথা থাকতে পারে না। তিনি চট্টগ্রামে এক সমাবেশে বলেন, 'আর কোনো কৈফিয়ত যুক্তি শুনতে চাই না। খুনীদের যে কোনো মূল্যে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং ওদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিতে হবে। বুঝিয়ে দিতে হবে হত্যার পরিণতি কি হতে পারে। তিনি পুলিশকে এই বলে নির্দেশ দেন, ওদেরকে ধরুন দয়ামায়াহীনভাবে। নির্মমভাবে আঘাত করুন। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করুন। এ কাজে যত কঠোর হবেন- ততোই সাহায্য পাবেন। এজন্য যত জবাবদিহীতা করতে হয়- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে তা আমি করব। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম থেকে মৌলবাদীদের শিকড় উপড়ে ফেলা হবে। তিনি একাত্তরের পরাজিত শক্তি জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা উচিত বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন

॥ তিন ॥

কিন্তু কে শোনে কার কথা? ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রামে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি ছাত্রাবাসে হামলা চালিয়ে ৩৮ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাহলে সরকার আসলে কি চাচ্ছে?

ঘটনা ঘটলো চট্টগ্রামে। আর পুলিশ হামলা চালালো রাজশাহীতে। বরিশাল মেডিকেল কলেজে ছাত্র লীগের কর্মীর সোম ও মঙ্গল এই দুই দিন ধরে বিভিন্ন হলে হলে হামলা চালিয়েছে। চট্টগ্রামে হুমায়ুন নামক জনৈক শিবির কর্মীরা ৬৫ বৎসর বয়সী বৃদ্ধ পিতা ইউসুফকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এর আগের দিন ৫০ জন শিবির কর্মীকে গ্রেফতার করা

www.pathagar.com

হয়েছে। ঐদিনও প্রধানমন্ত্রী তদন্ত ছাড়া জামায়াত-শিবিরকে দোষারোপ করা অব্যাহত রেখেছেন। সেই সাথে তিনি জাতীয় পার্টি ও বিএনপিকেও সন্ত্রাসের অভিযোগে লাগাতার দোষারোপ করে যাচ্ছেন। স্পষ্ট হয়ে গেছে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ৮ ব্যক্তি হত্যার হৃদয়বিদারক ঘটনাকে সম্মিলিত বিরোধী দলের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা শুরু করেছে। ১৬ এবং ১৭ জুলাই পত্র-পত্রিকা পড়ে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, এই নির্মম দুঃখজনক হত্যাকান্ড সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে মোড় নিচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যে ভাষা কথা বলছেন সেটা গণতন্ত্রের ভাষা নয়। তাদের বক্তৃতায় বারুদের গন্ধ পাওয়া যায়। স্তব্ধ বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে মানুষ। তাদের চোখে-মুখে আতঙ্ক, এরপর কি হয়? ঈশান কোণে কালো মেঘ।
(দৈনিক ইনকিলাব ১৮/৭/২০০০)

উপ সম্পাদকীয় অবগুণ্ঠন উন্মোচন আসিফ আরসালান

১১ই জুলাই ট্রিপল মার্ডারেই নিহিত আছে ১২ই জুলাইয়ের অষ্ট খুন ঃ কান টানলেই মাথা আসবে

১৩ই জুলাই বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে ৮ ব্যক্তির নৃশংস হত্যাকান্ডের খবর একশ্রেণীর সংবাদপত্রে যেভাবে পরিবেশিত হলো সেই ধরনটি দেখেই তাৎক্ষণিকভাবে আমার মনে বিরাট খট্‌কা লেগেছিল। ঘটনা ঘটলো বহদ্দারহাটে, আর সাথে সাথে আওয়ামী ঘরানার পত্রিকাগুলো সমস্বরে চীৎকার করে উঠলো যে ইসলামী ছাত্রশিবির এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছে। কোনোরূপ তদন্ত নাই এবং আজো তদন্তের কোনো উদ্যোগ নাই। বিচার বিভাগীয় তদন্তও হয়নি, নির্বাহী তদন্তও হয়নি। কিন্তু আওয়ামী লীগের মন্ত্রী মিনিস্টার থেকে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত তেড়ে মেড়ে বলে উঠলেন যে, জামায়াত-শিবিরই এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। ভাবখানা এই যেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম, ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী প্রমুখ নেতা গুলিবর্ষণের সময় অকুস্থানে উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যুৎগতিতে এই নিষ্ঠুর হত্যাকান্ডের ওপর রাজনৈতিক রং লাগিয়ে দেয়া হলো। আমার কিন্তু তখনি মনে হয়েছিল যে, এটি আর যাই হোক, কোনো রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নয়। প্ল্যান প্রোগ্রাম করে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটাতে গেলে অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করতে হয়। করতে হয় অনেক হিসাব নিকাশ। ইসলামী ছাত্রশিবির অথবা জামায়াতে ইসলামী কি এতই বোকা যে, তারা একসাথে ৮ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীকে হত্যা করার রিস্ক নেবে? কেন্দ্র অর্থাৎ ঢাকা ছেড়ে মফস্বল শহরের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ নয়, একটা সাধারণ কলেজের ৬ জন ছাত্রনেতাকে হত্যা করলে জাতীয় পর্যায়ে জামায়াতে ইসলামী বা ইসলামী ছাত্র শিবিরের রাজনৈতিক লাভ কতখানি? একজন পাগলও বোঝে যে, এই ধরনের হটকারী কাজে এক পয়সাও লাভ নাই। বরং ক্ষতি হয় ষোলআনা। বাংলাদেশের রাজনীতি সচেতন মানুষ বেশ কিছু দিন ধরেই আশংকা করছিলেন যে, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী দেশে শীঘ্রই ভয়াবহ এবং অশুভ কিছু একটা ঘটাবে। আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা এখন তলানীতে এসে ঠেকেছে। এই

www.pathagar.com

মুহূর্তে যদি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহলে আওয়ামী লীগকে জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে। আসন্ন পতন ঠেকানোর জন্য এখন প্রয়োজন জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানো। তাই চট্টগ্রামের এই অঞ্চলে এই নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটানো হলেও তাৎক্ষণিকভাবে জামায়াত-শিবিরের অফিস এবং নেতা-কর্মীদের ওপর সহিংস হামলা শুরু হয়েছে। হত্যাকান্ড ঘটেছে বহদ্দারবাড়ী হাটে, আর সাথে সাথে বিদ্যুৎ গতিতে জামায়াত এবং শিবিরের বিরুদ্ধে সারাদেশ জুড়ে হামলা শুরু হয়ে গেল। বরিশাল, ময়মনসিংহ, নারায়ণগঞ্জসহ দেশের অসংখ্য স্থানে জামায়াত-শিবিরের নেতা-কর্মীগণকে পাইকারীভাবে গ্রেফতার করা হচ্ছে। তাদের অফিস এবং বাসভবনে আওয়ামী লীগের ঝটিকা বাহিনী শারীরিকভাবে হামলা চালিয়েছে, পুলিশ জামায়াত অফিসের তালা ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকেছে, জামায়াত নেতার পেট্রোল পাম্পে আগুন ধরানো হয়েছে, কম্পিউটার ব্যবসায়ী জামায়াত কর্মীকে মারতে মারতে মেরে ফেলা হয়েছে। ৫০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে রাজশাহীতে। তারচেয়ে বেশী সংখ্যায় চট্টগ্রামে। এক কথায় সারাদেশে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। ষাটের দশকে একজন কবি একটি গদ্য কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটির প্রথম কয়েক লাইন হচ্ছে ঃ

আকাশেতে মারলাম ছোরা
লাগলো কলা গাছে
হাঁটু দিয়ে রক্ত পড়ে
চোখ গেলোরে বাবা।

কোনো লাইনের সাথে কোনো লাইনের মিল নাই। কোনো ভাব ও কথার সাথেও অগ্র-পশ্চাৎ কোনো মিল নাই। ভাবের দিক দিয়ে কোনো আগামাথা নাই। তবু সেটি একটি কবিতা। ঘটনা ঘটে চট্টগ্রামের বহদ্দারবাড়ী হাটে। গ্রেফতার হয় রাজশাহীতে। আর দল নিষিদ্ধ হয় ময়মনসিংহে। আজব কারবার আওয়ামী লীগ সরকারের। তবে তাদের মতলব ধরে ফেলেছেন বিএনপি'র চট্টগ্রাম নেতা মীর নাসির উদ্দিন। গত ১৭ জুলাই সোমবার দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, "বিএনপি'র চট্টগ্রাম মহানগরী সভাপতি মীর মোঃ নাসির উদ্দিন চট্টগ্রামে চলমান পুলিশী অভিযানের মাধ্যমে নগরবাসীকে আতঙ্কিত না করার জন্য প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, নগরীকে উৎকণ্ঠামুক্ত করতে শুধু প্রকৃত অপরাধীদের গ্রেফতার করা হোক। কেবল বহদ্দারহাট হত্যাকাণ্ডে জড়িত অপরাধীরাই আইনের অধীনে আসবে, কোনো অবস্থাতেই তাদের নিরপরাধ আত্মীয়স্বজন নয়। আত্মীয়স্বজনকে গ্রেফতারের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ আইনের পর্যায়ে পড়ে না। সাবেক মেয়র মীর নাছির পুলিশকে নিরপেক্ষভাবে কাজ করার সুযোগ দেয়ার দাবি জানান। তিনি বলেন, একটি মাইক্রোবাসে করে ১০/১২ জন সন্ত্রাসী হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে বলে পুলিশের ভাষ্য ও পত্রিকার খবর সত্ত্বেও ৩০ জনের নামে মামলা দিয়ে প্রকৃত অপরাধীদের আড়াল করা হয়েছে। এ মামলাকে বিরোধী দলের নেতা-কর্মীকে নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।"

(দৈনিক যুগান্তর, প্রথম পৃষ্ঠা)

www.pathagar.com

চট্টগ্রামের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর পরই আওয়ামী সরকার শ্বেত সন্ত্রাস কায়েম করেছে। আওয়ামী লীগের লাঠিয়াল বাহিনী মাঠ ঘাট চষে বেড়াচ্ছে। তাদের সাথে যুক্ত হয়েছে পুলিশ বাহিনী। ছাত্রলীগের ফ্যাসিবাদী ও নাৎসীবাদী সন্ত্রাস সারাদেশে এক ভয়াল ত্রাসের রাজত্ব কয়েম করেছে। হিটলার এবং মুসোলিনীর ব্ল্যাক সার্ট এবং ব্রাউন সার্টের আদলে ছাত্রলীগ এবং যুবলীগের ঝটিকা বাহিনী ইসলামী আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মীদেরকে তাড়া করছে। এই ভয়াল ও শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে আওয়ামী টেরোরিস্টদের হাতে বলি হয়েছে সত্যভাষণ এবং সত্যকথা। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আংশিকভাবে হলেও সত্য কথা বলেছেন জনাব নাসির উদ্দিন। তবে যতই দিন যাচ্ছে মিথ্যার আবরণ সত্যকে চাপা দিয়ে রাখতে পারছে না। ধর্মের কল বাতাসে নড়ছে। তাই আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী ঘরানার প্রতি দুর্বল পত্রিকা দৈনিক 'প্রথম আলো' আওয়ামী লীগের এই জামায়াত বিরোধী হামলা ও প্রচারণার গোপন মতলব উদঘাটন করেছে। গত ১৭ জুলাই সোমবার পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে একটি খবর ছাপা হয়েছে। সংবাদটির শিরোনাম হলো, "জামায়াত-শিবিরকে আঘাত করে বিরোধী জোটকে চাপে রাখতে আওয়ামী লীগের কৌশল।" এই সংবাদটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিক বলে আমরা সংবাদটির উল্লেখযোগ্য অংশ নীচে তুলে ধরলাম ঃ "চট্টগ্রামে ৬ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীসহ ৮ জনের হত্যাকারী শিবির ক্যাডাররা, এই সাধারণ অভিযোগের পটভূমিতে আওয়ামী লীগ জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবীতে রাজনৈতিক প্রচারাভিযানের উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য দলীয় কর্মসূচীর বাইরে একই দাবীতে নানা শ্রেণী-পেশার সংগঠনকেও মাঠে নামানো হবে। জামায়াত-শিবিরকে কোণঠাসা করতে এই আন্দোলন হলেও এর পেছনে রয়েছে ৪ দলীয় জোটের বিরোধী দলীয় রাজনীতির ওপর নেতিবাচক চাপ প্রয়োগ করা। জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজেই গত বুধবার ছাত্রলীগ কর্মীদের নিহত হওয়ার ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছেন। গত শুক্রবার সাংবাদিকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনার সময় তিনি এমন মন্তব্য করেছেন, 'পড়ে পড়ে কি শুধু মার খাব? ওই দিন রাতেই তিনি কয়েকজন সাবেক ছাত্রনেতার সঙ্গে বৈঠক করে জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য সম্ভাব্য সবকিছু করার নির্দেশ দেন। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এমন ৩জন সাবেক ছাত্রনেতার সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে সাবেক ছাত্রনেতাদের বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে মতবিনিময়ের নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আবদুর রহমান, অসীম কুমার উকিল, ইকবালুর রহিম, শফি আহমেদ, এস এম কামাল হোসেন, এনামুল হক শামীম, ইসহাক আলী খান পান্না এবং ছাত্রলীগের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে গত শনিবার সাবেক ছাত্রনেতাদের এক সভা আওয়ামী লীগ ফাউণ্ডেশনে হয়েছে। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে গতকাল একটি বিবৃতি দেয়া হয়েছে। গতকাল এসব ছাত্রনেতা, শিক্ষক, সাংবাদিক,

www.pathagar.com

আইনজীবী ও কয়েকজন সংস্কৃতিসেবীর সঙ্গে মত বিনিময় করেছেন। পরবর্তী সময়ে আরো বড় আকারে এই মতবিনিময় করা হবে বলে গতকালের সভা সূত্রে জানা গেছে। আগামী জাতীয় নির্বাচনে ৪ বিরোধী জোটকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করার কৌশল নিয়েছে আওয়ামী লীগ। এই কৌশলের অংশ হিসেবেই চট্টগ্রামের ঘটনাকে সামনে রেখে সারাদেশে একটি জামায়াত-শিবির বিরোধী জনমত গড়ে তুলতে চায় ক্ষমতাসীন দলটি। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা পালনকারী জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট বাঁধার কারণে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টিকেও স্বাধীনতা বিরোধী পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হতে চায় আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগের এই উদ্দেশ্য থেকেই সকল মুক্তিযোদ্ধাকে একটি মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এর আগে সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা ফ্রন্ট গঠিত হয়েছে। এই ফ্রন্টের উদ্যোগে ইতিমধ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে মুক্তিযোদ্ধা-জনতা সমাবেশ হচ্ছে। এসব মহাসমাবেশের পাশাপাশি এখন জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার আন্দোলন জোরদার করা হবে।"

॥ দুই ॥

জামায়াত-শিবির নয়, সেই চেনামুখরা এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। গত ১৭ জুলাই সোমবার দৈনিক যুগান্তরে' এই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে। পত্রিকাটির মতে, ফটিকছড়ির পাতালজগত দখল করার জন্যই এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। তাদের প্রশ্ন "এই নগরীর উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখার জন্যই কি এবারের হত্যাকাণ্ড ঘটেছে? এরা এখন পেশাদার সন্ত্রাসী। তাদের কাছে কোনো দল বা আদর্শ নয়, গ্রুপের স্বার্থই বড়।" বহদ্দারবাড়ী হাটে ৮ খুন কোনো তাৎক্ষণিক ঘটনা নয়। এর পেছনে তাৎক্ষণিক কারণ হলো আগের দিন ফটিকছড়িতে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ এবং ৩জন খুন। সেই গানফাইট হয়েছিল ছাত্রলীগেরই তৈয়ব গ্রুপ এবং টিপু গ্রুপের মধ্যে। তিনজনের হত্যাকাণ্ডের পর ২৪ ঘন্টাও অতিক্রম হয়নি। প্রচণ্ড বদলা নিল প্রতিপক্ষ। তিনজনের বদলে ৮ জন ঘটনার আড়ালের ঘটনার সূত্র রয়েছে আরো পেছনে। গত বছরের মে ও জুন মাসে সংঘটিত হত্যাকাণ্ড। সেই হত্যাকাণ্ডে নিহত হয়েছে টিপু, খুকুমণি, কমিশনার লিয়াকত প্রমুখ। ছাত্রলীগের নাসির গ্রুপ এবং কাদের গ্রুপের রক্তাক্ত সংঘর্ষের কথা কে না জানে। কানা বক্কর গ্রুপের হাতে নিহত হয়েছে একটি কলেজের জিএস। ছেড়া আকবর ও তাহের গ্রুপ বনাব আজম, নাসির গ্রুপের লড়াইয়ের খবরও আজ আর অবিদিত নয়। ছেঁড়া আকবরের গডফাদার কে, সে কথা আজ নতুন করে বলার কি আর কোন প্রয়োজন আছে? ঢাকার ইউসিবিএল দখল করেছিল কারা? সেই সময় দৈনিক প্রথম আলোয় টাক মাথায় যে ছবির ছাপা হয়েছিল সেই ছবির চরিত্রটিকে কেউ ভোলেনি।

সেই ছেঁড়া আকবরের নাম ১১ ও ১২ তারিখের হত্যাকাণ্ডে পত্রিকার পাতায় উঠে এসেছে। শেখ হাসিনার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম কি জানেন না যে কান টানলেই মাথা আসে? আসলে তারা একটি বা দু'টি কান ধরে জোরে টানুন না কেন? তাহলেই মাথা চলে আসবে। জামায়াত এবং শিবিরের বিরুদ্ধে গদা ঘুরালে হয়তো সাময়িক রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল

www.pathagar.com

হতে পারে, কিন্তু তাতে অপরাধ দমন হবে না। অপরাধ বরং দশানন হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। রাজনৈতিক স্বার্থের গেরুয়া বসনে দাগী খুনীদের হয়তো সাময়িকভাবে আড়াল করা যাবে। কিন্তু নিরেট সত্যকে চিরদিন চেপে রাখা যাবে না।

দৈনিক সংগ্রাম- ২০/৭/২০০০

চট্টগ্রামের এইট মার্ডার ঃ সরকার কি সন্ত্রাস দমনে আন্তরিক?

আবদুল গফুর

সরকার কি দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের প্রশ্নে আন্তরিক? আমাদের মনে এ সংশয় সৃষ্টি হচ্ছে বলেই প্রশ্নটি তুলছি। গত ১১ ও ১২ জুলাই চট্টগ্রামে পরপর দু'টি নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। ১১ জুলাই ৩ জনকে এবং ১২ জুলাই ৮ জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। প্রথম হত্যাকাণ্ড যে ছিল ছাত্র লীগের অন্তর্কোন্দলজনিত কারণে, তা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকেই জানা গিয়েছিল। এরপর দিন যে হত্যাকাণ্ড ঘটে, তাকে পূর্ববর্তী দিনের হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ হিসাবে অনেকেই ধরতে চাইবে স্বাভাবিকভাবে, যদিও তা যে সত্য হবেই এমন গ্যারান্টি নেই। কিন্তু দেখা গেল, ১২ জুলাইয়ের ঘটনাকে সাথে সাথে ছাত্র শিবিরের কাণ্ড বলে প্রচার চালিয়ে জামায়াত-শিবিরের ওপর হামলা ও আক্রমণ চালানো শুরু হয়। লক্ষ্যযোগ্য যে, ঐ নৃশংস ঘটনার পর কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই এ ধরনের একটি অনিয়মতান্ত্রিক অভিযান চালানোর সপক্ষে উস্কানিমূলক বক্তব্য দেন স্বয়ং সরকার প্রধান এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাদের মুখের দিকে সন্ত্রাস দমনের আশায় তাকিয়ে থাকে দেশের তের কোটি মানুষ।

আলোচনা শুরুর আগে একটা কথা স্পষ্ট বলে রাখতে চাই ঃ আমি অতীতেও কখনও জামায়াত-শিবিরের সদস্য ছিলাম না, এখনও নই। ছাত্র শিবিরের কোন নেতা বা কর্মী যদি সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকে, আমি তার বিচার ও শাস্তি কামনা করি, যেমন কামনা করি ছাত্রলীগ সহ অন্যান্য কোন ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের বিচার ও শাস্তি। এবং সেসব বিচার হতে হবে অবশ্যই সুষ্ঠু তদন্তের পর নিয়মতান্ত্রিক পথে বিচার বিভাগের মাধ্যমে। যেহেতু পুলিশ বাহিনী আমাদের দেশে অনেকটাই শাসক দলের দ্বারা প্রভাবিত থাকে এবং যেহেতু তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও শাসক দলের প্রতি পক্ষপাত উভয় অভিযোগই প্রবল, সুতরাং সুবিচারের স্বার্থে ভাল হয় বিচার বিভাগীয় তদন্তের পর প্রকৃত অপরাধী ও অপরাধের মূল কারণ নির্ণয়ের মাধ্যমে দোষীর শাস্তি বিধান করা। কিন্তু কি কারণে জানি না, সেসব পথে না গিয়ে, এমনকি, পুলিশী তদন্ত শুরু হবারও আগেই একটি ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে 'এ্যাকশন' শুরু করতে তারা পুলিশ বিভাগের প্রতি নির্দেশ দিলেন এবং তাতেও সন্তুষ্ট হতে না পেরে সারাদেশে সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনটিকে মাঠে নামিয়ে দেয়া হল। সরকারের যে নেতৃবৃন্দ মাঝে-মধ্যেই নিজ হাতে আইন তুলে না নিতে জনগণের প্রতি উপদেশ বর্ষণ করেন, এখন দেখা যাচ্ছে তারাই নিজ হাতে আইন তুলে দিতে তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতা-কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন।

www.pathagar.com

সরকারের নেতৃবৃন্দ কি জানেন না, শাসক দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠনটির বহু নেতা-কর্মীই বর্তমান মুহূর্তে শুধু সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজিই নয়, ধর্ষণ, খুন-খারাবী প্রভৃতি কর্মেও ব্যাপকভাবে লিপ্ত থেকে সংগঠনটির জন্য ইতিমধ্যেই যথেষ্ট বদনাম ডেকে এনেছে? এসব ব্যাপারকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে গ্রুপিং অন্তর্কোন্দল, সশস্ত্র হামলা, পাল্টা হামলা মাঝে মাঝে এতটাই বেড়ে যায় যে, এ নিয়ে মাঝে-মধ্যেই সরকার প্রধান এবং সরকারের অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে যে ভয়ঙ্কর অস্বস্থিকর অবস্থায় পড়তে হয়- তা তো সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলো পাঠ করলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। সরকার যদি দেশে সন্ত্রাসমুক্ত গণতান্ত্রিক আবহ সৃষ্টি করতে চান, তাহলে শাসকদলকেই প্রথমে সন্ত্রাসমুক্ত করার নজির স্থাপন জরুরী নয় কি? কথায় বলে- চ্যারিটি বিগিন্‌স অ্যাট হোম- আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়ো। কিন্তু এ কেমন কথা যে নিজেরা সন্ত্রাস ও খুন-খারাবীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে সেদিকে দৃষ্টিপাত না করে শুধু বিরোধী রাজনৈতিক দল ও তাদের ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সন্ত্রাস আবিস্কার এবং তাদের বিরুদ্ধে গদা ঘুরানোর চিন্তা করা হবে? এ পথ তো দেশ থেকে সন্ত্রাস নির্মূল করার পথ নয়- এ হচ্ছে সন্ত্রাস একচেটিয়াকরণের পথ। অর্থাৎ তুমি সরকারবিরোধী দল কর, তুমি সন্ত্রাস করবে কেন, তোমার সে অধিকার নেই, সন্ত্রাস করবো শুধু আমরা এবং আমাদের দলের সন্ত্রাসী ও ক্যাডাররা।

একথা এভাবে বলতে বাধ্য হচ্ছি, কারণ বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধান বিরোধী দল ও তার অঙ্গ-সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে একটানা সন্ত্রাস চালিয়েছে বহুদিন ধরে। তাদের মিটিং-মিছিল অন্যায়ভাবে পুলিশ দিয়ে ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। তাদের অফিসে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে। তাদের ডাকা হরতালের সময় পিকেটিংয়ের নিয়মতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে নেতা-কর্মীদের বেধড়ক মারধর ও হয়রানি করার পরও মিথ্যা মামলা দিয়ে আটক রাখা হয়েছে। পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাদের ওপর অকথ্য দৈহিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। নিজেরা বিরোধী দলে থাকা অবস্থায় দিনের পর দিন হরতাল করেও ক্ষমতায় আসার পর তারাই হরতালকে অবাঞ্ছিত প্রমাণের কসরৎ চালিয়েছে। এসব বিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার ফলে সরকারের জনপ্রিয়তা যতই হ্রাস পাচ্ছে, ততই সরকার এখন অধিক হতে অধিক মাত্রায় নৃশংস হয়ে পড়ছে বিরোধী দলসমূহের বিরুদ্ধে। উন্মত্ত হয়ে উঠেছে উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে হলেও বিরোধী শিবিরকে কোণঠাসা করতে- যার সর্বশেষ প্রমাণ দেখা যাচ্ছে চট্টগ্রামের ঘটনার মধ্যে।

আমরা এখনো জানি না যে, চট্টগ্রামের ১২ জুলাইয়ের ঘটনার পেছনে ছাত্রলীগের কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব কাজ করেছে কিনা। তবে চট্টগ্রামের ছাত্রলীগের মধ্যে যে বছরের পর বছর ধরে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে তার প্রমাণ মেলে, সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকায়ও। এমনকি ১২ জুলাইয়ের ঘটনার পরও যে এ অন্তর্কোন্দলের পূর্ণ নিরসর হয়নি, তাও গত ১৮ জুলাইয়ের কয়েকটি সরকার সমর্থক পত্রিকায় প্রতিবেদন থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। কারণ এই অন্তর্কোন্দল মিটাতে ঢাকা থেকে ছাত্রনেতাকে গিয়ে দীর্ঘ বৈঠক করতে হয়েছে সেখানকার ছাত্র লীগের তিনটি গ্রুপের সাথে এবং তাতেও নাকি শেষ সুরাহা হয়নি। শেষ সুরাহা করতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে চট্টগ্রাম যেতে হয়েছে।

www.pathagar.com

১৮ জুলাইয়ের পত্র-পত্রিকাতেও দেখা গেছে, চট্টগ্রামের এ হত্যাকান্ডের ব্যাপারে বিভাগীয় তদন্তকারীরা এখনও পর্যন্ত হত্যাকাণ্ডের কোন সূত্র আবিষ্কার করতে পারেনি। তারা প্রকৃত সত্য উদ্ধার করতে পারবেন কিনা এ নিয়েও অনেকে শেষ পর্যন্ত সংশয়াপন্ন থাকতে পারেন। পুলিশ বিভাগের মারফৎ তদন্ত অনুষ্ঠিত না হয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলে জনগণ সত্য উদ্ধারের ব্যাপারে অধিক আশাবাদী হতো। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এবং বিরোধী দল বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করলেও কোন অজ্ঞাত করণে জানি না, সরকার সে দাবীকে মোটেই বিবেচনায় আনছে না। বরং কোনরূপ তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশের আগেই নিজেরা এই হত্যাকান্ডের জন্য ছাত্র শিবিরকে দায়ী করে দেশের সর্বত্র পুলিশ ও ছাত্রলীগকে জামায়াত-শিবির নির্মূল অভিযান জোরদার করতে আহ্বান জানিয়েছে।

আমরা বুঝি না সরকার যদি সত্যিই দেশ থেকে সন্ত্রাস উচ্ছেদ করতে আগ্রহী হন বা চট্টগ্রাম হত্যাকাণ্ডের প্রকৃত অপরাধীদের সনাক্ত করতে চান, তাহলে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী মেনে নিতে তাদের অসুবিধা কোথায়? এ ব্যাপারে সরকারের অনীহা সত্য উদ্ধারে তাদের আগ্রহের আন্তরিকতা নিয়েই সন্দেহের জন্ম দিচ্ছে। জনগণ ধারণা করছে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলে সরকারের সন্ত্রাস দমনে অনীহা এবং স্বদলীয় সন্ত্রাস লালনের ক্ষেত্রে এমন সব তথ্য বেরিয়ে পড়তে পারে যাতে সরকারের ভাবমূর্তি নিদারুণভাবে ক্ষুণ্ন হতে পারে।

সন্ত্রাস আমাদের সমাজ দেহে যে দুষ্ট ক্ষত সৃষ্টি করেছে তা সমূলে উৎপাটিত হোক- এ কামনাই আমরা করি। শুধু চট্টগ্রামের সন্ত্রাসই নয়, সারাদেশের সন্ত্রাস নির্মূলের খাতিরেই এ ব্যাপারে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হওয়া উচিত। সরকার প্রধান প্রায় প্রায়ই তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতিতে একটি অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন- সন্ত্রাসী যে দলেরই হোক, তাকে দমন করতে হবে। এ ধরনের একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠিত হলে প্রধানমন্ত্রীর এ আকাঙ্খা পূরণও সহজতর হত। প্রশ্ন হচ্ছে, সরকার কি এতে রাজি আছেন? অন্য কথায়, সরকার কি সন্ত্রাস নির্মূলে, না সন্ত্রাস মনোপোলাইজেশনে আগ্রহী?

সরকার যদি সন্ত্রাস নির্মূল বা সন্ত্রাস মনোপলাইজেশন তথা একচেটিয়াকরণে আগ্রহী হয়ে থাকেন, তাহলে সন্ত্রাস দমন না করে বিরোধী দল সন্ত্রাসী, সেটা প্রচার করে সন্ত্রাস দমনের নামে বিরোধী দল দমনের আওয়ামী ঐতিহ্যবাহী পথে অগ্রসর হতে পারেন। সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকা পাঠে আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে, সরকার সেই পথেই অগ্রসর হতে উৎসাহী। গত ১৭ জুলাই ঢাকার একটি বাংলা দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় 'জামায়াত-শিবিরকে আঘাত করে বিরোধী জোটকে চাপে রাখতে আওয়ামী লীগের কৌশল' শীর্ষক তিন-কলামের শিরোনামের একটি সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, "চট্টগ্রামে ছয়জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীসহ আটজনের হত্যাকারী শিবির ক্যাডাররা- এই সাধারণ অভিযোগের পটভূমিতে আওয়ামী লীগ জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবীতে রাজনৈতিক প্রচারাভিযানের উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য দলীয় কর্মসূচীর বাইরে একই দাবীতে নানা শ্রেণী-পেশার সংগঠনকেও মাঠে নামানো হবে। জামায়াত শিবিরকে কোণঠাসা করতে এই আন্দোলন হলেও এর পেছনে রয়েছে চারদলীয় জোটের বিরোধী দলীয় রাজনীতির ওপর নেতিবাচক চাপ প্রয়োগ করা।'

www.pathagar.com

প্রতিবেদনে স্বয়ং সরকার প্রধান এ ব্যাপারে কোন কোন বর্তমান ও সাবেক ছাত্রনেতার সাথে বৈঠক করেছেন এবং কিভাবে বিরোধী দলীয় জোটকে কাবু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে- সে সম্পর্কেও বিস্তারিত বিবরণী দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনের এক পর্যায়ে বলা হয়েছে- 'আগামী জাতীয় নির্বাচনে চার বিরোধী দলীয় জোটকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করার কৌশল নিয়েছে আওয়ামী লীগ। এই কৌশলের অংশ হিসেবেই চট্টগ্রামের ঘটনাকে সামনে রেখে সারাদেশে একটি জামায়াত-শিবির বিরোধী জনমত গড়ে তুলতে চায় ক্ষমতাসীন দলটি। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ভূমিকা পালনকারী জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে জোট বাঁধার কারণে বিএনপি এবং জাতীয় পার্টিকেও স্বাধীনতাবিরোধী পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত করে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হতে চায় আওয়ামী লীগ।'

এ প্রতিবেদনের সাথে সরকারের কর্মকাণ্ডের অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখা যায়। এতেই মনে হয় সন্ত্রাস নির্মূল নয়, সন্ত্রাস নির্মূলের নামে বিরোধী দল নির্মূল এবং আগামী সাধারণ নির্বাচনে বিরোধী দলকে কোণঠাসা করার উপায় উদ্ভাবন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মূল লক্ষ্য। একটি শাসক দলের জন্য এ ধরণের মনোভাব জাতির জন্য তো নয়ই, গণতন্ত্রের জন্যও মোটেই অশাব্যঞ্জক হতে পারে না।

দেশে গণতন্ত্রের বিকাশের পথে সন্ত্রাস বিরাট বাধা। দেশে দলীয় সন্ত্রাস লালনের মাধ্যমে নৈরাজ্য ও অরাজকতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। অরাজকতা ও অসহনশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে সাময়িকভাবে ফায়দা লুটা যেতে পারে, ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার চেষ্টা চালানো যেতে পারে। কিন্তু তার দ্বারা দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হতে পারে না। দেশে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ছাড়া স্থিতিশীল ও জাতীয় অগ্রগতিও আশা করা যায় না।

কিন্তু দেশ ও জাতির কথা যদি বাদও দেয়া যায়-এর দ্বারা শাসক দলই কি কোনমতে লাভবান হতে পারবে? একথা বরং নিশ্চিতভাবেই বলা যেতে পারে, এর দ্বারা স্বয়ং আওয়ামী লীগও চূড়ান্ত বিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। দলের মধ্যে সন্ত্রাসী লালন কোন দলের জন্যই প্রকৃত শক্তির প্রমাণ বহন করে না। কারণ সন্ত্রাসীরা যখন বুঝতে পারে তাদের সন্ত্রাস দলের দাপট ও শক্তির উৎস, তখন তারা স্বাভাবিকভাবেই দলের ওপর নিয়ন্ত্রণ বিস্তার করতে চাইবে এবং তখন তাদের বাধা দেয়া হলে তারাই দলীয় নেতৃত্বের জন্য ফ্রাঙ্কেস্টাইন রূপে আবির্ভূত হতে পারে।

এসব কথাও যদি বাদ দেয়া যায়, তবুও যে কোন অন্যায় অত্যাচারের নৈতিক দায়দায়িত্ব থেকে কেউ কি কখনও রেহাই পেতে পারে? পারে না। ইসলামের জীবনবিধানে 'হক্কুল এবাদ' বলে একটি কথা আছে। হক্কুল এবাদ অর্থ মানুষের অধিকার। সন্ত্রাস বা যে কোনরূপ অন্যায়-অবিচার, অত্যাচারই মানুষের খোদাদত্ত অধিকার লংঘন। সন্ত্রাস বা মানুষের কোন অধিকার লংঘনকারী জালেমরা পৃথিবীতে যত বড় শক্তিশালীই হোক, তারা কোনক্রমেই আল্লাহর বিচার থেকে রেহাই পায় না। আর মজলুমের আর্তনাদ সরাসরি আল্লাহর আরশে পৌঁছে যায়। এ কারণে দেখা যায়, আল্লাহর বিচারের কিছুটা এ দুনিয়াতেও বাস্তবায়িত হয় নানা ঘটনা পরম্পরার মাধ্যমে। কোরআন শরীফে আল্লাহ পাক বলেন- আমি এক শক্তি দিয়ে অন্য শক্তিকে দমন না করলে বিশ্ব মনুষ্য বাসোপযোগী থাকত না। সামাজিক

www.pathagar.com

ইনসাফের এই ঐশী বিধানের ধারায়ই দেখা যায়- কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে যে ব্যক্তি সদম্ভ উচ্চারণ করেছে- কোথায় গেল আজ তারা?- সে-ই হয়তো বছর পেরোবার আগেই নির্মমভাবে অন্যের হাতে নিহত হচ্ছে।

মানব ইতিহাসের সবচাইতে বড় ট্রাজেডী হলো, আমরা না আল্লাহর শাশ্বত বিধান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করি, না শিক্ষা গ্রহণ করি ইতিহাস থেকে। জীবনে জন্মগ্রহণ করার পর আমাদের সকলের জন্যই যে মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তী অনন্ত সুখ বা দুঃখের জীবন অপেক্ষা করছে, যে জীবনের সাফল্য-ব্যর্থতা সবই নির্ভর করছে আমাদের ইহকালীন ক্ষুদ্র জীবনকালে আমাদের আচরণের ওপর এই সত্যটাই আমরা ভুলে গিয়ে দু'দিনের জীবন এবং এই জীবনের তুচ্ছ ক্ষমতা ও দাপটকেই আমরা বড় করে দেখি এবং মনে করি, অথচ বাস্তবতা তো ঠিক এর বিপরীত। পার্থিব জীবনের এই কঠোর সীমাবদ্ধতা কবুল করে নিয়ে আমরা কি পারি না সব রকম দাম্ভিকতা ও বৈষম্য -চিন্তা পরিহার করে সকল ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জন্য সেই অধিকার নিশ্চিত করতে, যা আমি আমার ব্যক্তি ও গোষ্ঠীসত্তার জন্য কামনা করি? সংক্ষেপে বললে, এটাই কিন্তু ইসলামের সমাজ দর্শনের মৌল শিক্ষা।

ইনকিলাব ২০/৭/২০০০

সন্ত্রাস, হত্যা ও আওয়ামী কৌশলের পরিণতি সরল পাঠ

এক.

মানুষ খুন হচ্ছে ঘরে, বেডরুমে, বারান্দায় কিংবা বসার ঘরে। খুন হচ্ছে অফিসে, রাস্তায় ফুটপাতে- সর্বত্র। যেখানে যেভাবে পেটে বা গলায় ছুরি ঠেকানো যায় সেখানেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। কাছে থেকে বা দূরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে বা আড়ালে ট্রিগার টিপতে সময় ব্যয় হচ্ছে না। বুক ভেদ করে যাচ্ছে গুলি, কিংবা পাকা বেলের মতো খুলি ফুটো করে ফেটে যাচ্ছে অব্যর্থ বুলেটে মানুষের মাথা। চট্টগ্রামে ছয়জন নেতা-কর্মীসহ আটজনকে গুলি করে হত্যার খবরে মানসিক ও শারীরিক অসুস্থবোধ করেছেন এমন মানুষের সংখ্যা কম নয়। ভীত ও আতঙ্কিত মানুষের কথা বলছি না। যাঁরা মানসিক ও শারীরিক অসুস্থ বোধ করেছেন তাঁদের সকলকেই ভীতু বলা ভুল হবে। অসুস্থ, কারণ আমরা একটা অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন সময়ের মধ্যে প্রবেশ করছি। চট্টগ্রাম হত্যাকান্ডের রক্ত শুকানোর আগেই খবর এলো জনকণ্ঠের সাংবাদিক শামছুর রহমানকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। বন্দুকের নল বুলেটসহ সংবাদপত্রের পাড়ায় ঢুকে পড়েছে।

প্রথম আলো (সোমবার, ১৭ জুলাই ২০০০) খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটি খবর দিয়েছে জামায়াত-শিবিরকে আঘাত করে বিরোধী জোটকে চাপে রাখতে আওয়ামী লীগের কৌশল'। খবরে বলা হয়েছে, 'চট্টগ্রামে ছয়জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীসহ আটজনের হত্যাকারী শিবির ক্যাডাররা- এই সাধারণ অভিযোগের পটভূমিতে আওয়ামী লীগ জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে রাজনৈতিক প্রচারাভিযানের উদ্যোগ নিয়েছে'। এই প্রচারাভিযান অনেকটা যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহণ করেছে। সারা দেশেই ছাত্রলীগ-শিবির

www.pathagar.com

মুখোমুখি। শেখ হাসিনা মন্তব্য করেছেন, 'পড়ে পড়ে কি শুধু মার খাব?' তার মানে কী? তিনিও মার দেবেন? দেখা যাচ্ছে আইন, রাষ্ট্র, পুলিশ ও প্রশাসন সম্পূর্ণ গৌণ একটা ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ইসলামী ছাত্রশিবির যেহেতু ছাত্রলীগ কর্মীদের মেরেছে অতএব তাদেরকেও মারতে হবে।

প্রথম আলোর খবরের ইঙ্গিতটা হচ্ছে অনেকটা এইরকম। চট্টগ্রাম হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জামায়াত-শিবির জড়িত কিনা সেটা এখনো পরিষ্কার নয়। কারণ হত্যাকারী এখনো ধরা পড়েনি। বলা বাহুল্য, জামায়াত-শিবির এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে অবশ্যই। সেটা সত্য হতে পারে, কিংবা হয়তো সেটা নিছকই অনুমান। এই অনুমান অসঙ্গত বা অস্বাভাবিক নয়। কারণ ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে জামায়াত-শিবিরের অভিযান চালানোর মতো পরিস্থিতি চট্টগ্রামে অবশ্যই রয়েছে। শেখ হাসিনা বিষয়টি নিয়ে কয়েকজন সাবেক ছাত্রনেতার সঙ্গে আলাপ করার সময় 'জামায়াত-শিবিরের পাশাপাশি সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধেও' জনমত গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। ছাত্রলীগের ওপর এই আঘাতের উৎস হতে পারে যেকোনো সন্ত্রাসী প্রতিপক্ষ।

কিন্তু প্রথম আলোর প্রতিবেদনে স্পষ্ট যে, পুরো বিষয় পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠার আগে ঘটনাটি আওয়ামী লীগ ব্যবহার করছে প্রতিপক্ষ বিরোধী জোটকে ঘায়েল করার জন্য। তারা দাবি তুলেছে, জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হোক। এটা প্রথম আলোর প্রতিবেদন অনুযায়ী একটি রাজনৈতিক কৌশল। যদি প্রথম আলোর এই মূল্যায়ন সঠিক হয় তাহলে এই কৌশল জামায়াত-শিবিরকে দুর্বল করা দূরের কথা- সাংগঠনিক ও সামরিক উভয় দিক থেকেই বরং তাদের শক্তিশালী করবে। জামায়াত-শিবির অতি অনায়াসেই তাদের ক্যাডারদের বোঝাতে সক্ষম হবে যে কোনো প্রকার সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া রাজনৈতিক ফায়দার জন্য আওয়ামী লীগ তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এতে জামায়াত-শিবিরের ক্যাডারদের মনোবল বৃদ্ধি হবে। দ্বিতীয়ত রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি মূলত পরাজিতের দাবি। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ হিসেবে আওয়ামী লীগের এই দাবি দলের রাজনৈতিক শূন্যতা এবং মেরুদণ্ডহীনতাই প্রমাণ করে।

জনগণের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, আওয়ামী লীগ তার প্রতিপক্ষের কাছে হারছে। না, সন্ত্রাসী হামলা বা পাল্টা হামলায় নয়। রাজনৈতিকভাবে হারছে। জনগণের চোখে আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী প্রতিটি দলই সন্ত্রাসী। সন্ত্রাস ছাড়া সুস্থ রাজনীতির মুরোদ এদের কারোরই নেই। অতএব এক সন্ত্রাসীর হাতে আরেক সন্ত্রাসীর মার খাওয়াটা হার নয়। কিন্তু জামায়াতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা রাজনৈতিক পরাজয়। জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবি আওয়ামী লীগের দুর্বলতাই প্রমাণ করছে। সন্ত্রাসী ক্ষমতার দিক থেকে যতটা না, তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক ক্ষমতার দিক থেকে দুর্বলতা। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায়, অথচ আশ্চর্য যে সন্ত্রাস দমন করতে পারছে না। এটা খুবই লজ্জার কথা। যদি জামায়াত-শিবির এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকে তাকে শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেই। যদি থাকে তাহলে

www.pathagar.com

হত্যাকারী এতক্ষণে ধরা পড়ার কথা এবং তাদের শাস্তি হওয়ার কথা। সেটা হয়নি, অথচ রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি উঠছে। এখানেই পরাজয়।

তাছাড়া রাজনীতি নিষিদ্ধ করলেই রাজনীতি বন্ধ হয় না। বরং সেই রাজনীতির পক্ষে জনমত আরো পোক্ত হয়। তার শক্তি আরো বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী লীগের এই কৌশলের পরিণতি আওয়ামী লীগের জন্য আত্মঘাতী হতে পারে। দেশের জন্যও বটে। এটা কি জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি মোকাবিলা করার সঠিক রাজনৈতিক কৌশল হতে পারে?

বিষয়টি আরো জটিল হয়ে গেছে, কারণ ১৪ জুলাই শুক্রবার দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পাতায় একটি খবর বেরিয়েছে। ইত্তেফাকের খবরে বলা হয়েছে, আটটি হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব স্বীকার করে 'জাতীয় বিপ্লবী কাউন্সিল' নামের একটি সংগঠন প্রেস বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রথম ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদন্ডের প্রতীক হিসেবে এই হত্যাকাণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। সাদা কাগজে টাইপ করা এবং জাতীয় বিপ্লবী কাউন্সিলের কমান্ডার ইন চিফের নামে ১২ জুলাই তারিখে অস্পষ্ট স্বাক্ষরে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে, 'অদূর ভবিষ্যতের জন্য আমরা দেশ ও জাতির স্বার্থে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করিয়াছি। ভবিষ্যতে ব্যাপক কর্মসূচীর মধ্যে থাকিবে দেশের সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের লাগামহীন চাঁদাবাজী ও হয়রানি বন্ধে ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড এবং দুর্নীতিবাজ ও সন্ত্রাসী নির্মূল অভিযান। এ ব্যাপারে আমরা রাষ্ট্রের প্রত্যেক অংশীদার ব্যক্তি হইতে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ কামনা করিতেছি। সরকার বা প্রতিপক্ষ কোনো কিছু বাড়াবাড়ি করিয়া কোনো সুফল আশা করতে পারেন না। আমরা এলটিটিই হইতে ভয়ানকরূপে আবির্ভাব হইব।'

এর আগে ১১ জুলাই তারিখের আরেকটি খবরও গুরুত্বপূর্ণ। ফটিকছড়ি থানার কাঞ্চনগর পাহাড়ি এলাকায় ১০ জুলাই মঙ্গলবার দুপুরে ছাত্রলীগ নামধারী এক গ্রুপ সন্ত্রাসীদের গুলিতে অপর গ্রুপের তিনজন নিহত ও পাঁচজন আহত। (ভোরের কাগজ, ১১ জুলাই, ২০০০) ছাত্রলীগের টিপু বাহিনী ও তৈয়ব বাহিনীর এই সংঘাত পরের দিনের আট খুনের ডামাডোলে চাপা পড়ে গেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যুদ্ধ শুধু ছাত্রলীগ আর জামায়াত-শিবির ক্যাডারদের মধ্যে নয়, ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ অন্তর্কলহও একটা যুদ্ধের রূপ পরিগ্রহণ করছে। দুইয়ের মধ্যে আদৌ কোনো সম্পর্ক আছে কিনা সেটা আমাদের মতো নিরীহ নাগরিকদের পক্ষে বোঝা মুশকিল।

এই অস্পষ্টতার অবসান হয়তো হবে। কিন্তু কখন হবে বলা মুশকিল। কিন্তু শেখ হাসিনা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অতিশয় অপরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক কৌশল ততদিনে রাজনৈতিক সংঘাত ও অঘোষিত গৃহযুদ্ধকে কোথায় ঠেলে দেবে কে জানে!

দুই.

কিন্তু এটা কি সত্য নয় যে, জামায়াত-শিবির রাজনীতির মোকাবিলা একটা রাজনৈতিক দায় হয়ে রয়েছে? অবশ্যই। বাংলাদেশে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সংগ্রাম যাকে কোনোভাবে উপেক্ষা করা চলে না। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আওয়ামী লীগ ও তার সমর্থকরা জামায়াত-

www.pathagar.com

শিবিরকে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে টিকিয়ে রেখেছে। বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আঁতাত করতে তার বাধেনি। রাজনৈতিক দিক থেকে তার পরিণতি হয়েছে মারাত্মক। ফলে রাজনৈতিক, সাংগঠনিক এবং সামরিক সব দিক থেকে জামায়াত-শিবির শক্তিশালী হয়েছে। এখন বিরোধী জোটের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টির কৌশল আর যুদ্ধ ঘোষণার দ্বারা কি জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি মোকাবিলা করা সম্ভব? আমরা জামায়াত-শিবির বিরোধী লড়াইয়ের একটা কালপর্ব পেরিয়ে এসেছি। এখন শুধু বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি নয়, আঞ্চলিক ও বিশ্ব পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। তাকে বিবেচনায় নিতে হবে। তাছাড়া শেয়ালের গলায় বাঘের হুংকার তুললে কি লাভ হবে এখন?

জামায়াত-শিবির রাজনীতির মোকাবিলার ব্যর্থতা কি জামায়াত-শিবির সন্ত্রাসের বিপরীতে আওয়ামী সন্ত্রাসের অপর্যাপ্ততা বা অক্ষমতা? মোটেও নয়। বরং জামায়াত-শিবিরের তুলনায় সন্ত্রাসী ক্ষমতা আওয়ামী লীগের বেশি। হুংকার কিংবা সন্ত্রাসী শক্তির অভাব নেই আওয়ামী লীগের। মুশকিল হলো জামায়াত-শিবির-ফ্রিডম পার্টি নয়, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস, কিংবা সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে সামরিক শক্তি খাটানো যায়। কিন্তু রাজনীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ধরণও রাজনৈতিক হতে হবে। জামায়াত-শিবির যদি ফ্রিডম পার্টির মতো নিছকই একটি সন্ত্রসী দল হতো তাহলে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে পাল্টা সন্ত্রাসে হয়তো কাজ হতো।

জামায়াত-শিবির ধর্মের একটি রাজনৈতিক রূপ কিংবা রাজনীতির ধর্মীয় রূপ। এই সত্যটা আমরা আজ অবধি স্বীকার করিনি। এ কথাটা আমরা সবসময়ই ভুলে থেকে অবিরাম বোধ করেছি। ধরে নিয়েছি রাজাকার যুদ্ধাপরাধী কিংবা ধর্ষক হিসেবে প্রমাণ করতে পারলেই জামায়াত-শিবিরের রাজনীতির একটা রফা হয়ে গেল। স্বাধীনতা যুদ্ধে জামায়াত-শিবিরের ভূমিকার জন্য বিচার দরকার, এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই। কিন্তু একাত্তরের ঘাতক, খুনি, রাজাকার বা ধর্ষক হিসেবে প্রমাণ করতে পারলেই জামায়াত-শিবিরের মতাদর্শকে পরাস্ত করা সম্ভব এই ধারণা অতিশয় বালখিল্য। সে ক্ষেত্রে জামায়াত-শিবির নামে না হোক, ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলন কিংবা হরকাতুল জেহাদ ধরণের ভিন্ন নামে একই রাজনীতির বাড় ও বৃদ্ধি ঘটবে। ঘটতে বাধ্য। আমাদের বোঝার দরকার ধর্মভিত্তিক রাজনীতিটা আসলে কি? তার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াই কীভাবে চালাব আমরা? অথচ এটা তো গণসংগ্রামের প্রধান দিক যা আমরা ধর্মপ্রাণ বা নাস্তিক কেউই উপেক্ষা করতে পারি না। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে সংগ্রামের নীতি ও কৌশল সঠিকভাবে নির্ধারণের ওপরই বাংলাদেশের ভবিষ্যত বিকাশের পথ স্থির হবে। অন্য কোনোভাবে নয়।

বাংলাদেশ ইউরোপ নয়। চার্চের বিরুদ্ধে প্রটেস্টান্টদের লড়াইও এখানে সম্ভব নয়। মসজিদ অর্থনৈতিক দিক থেকে শোষণমূলক প্রতিষ্ঠান নয়, কিংবা চার্চের মতো এখানে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবনও ঘটেনি। ফলে ওর বিরুদ্ধে কৃষক বা খেটে খাওয়া মানুষদের খেপিয়ে তোলা সম্ভব নয়। বরং পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে জালিমের বিরুদ্ধে মজলুমের সংগ্রাম হিসেবে ইসলাম একটা মতাদর্শ রূপ পরিগ্রহণ করে বসতে পারে। তাহলে এর বিরুদ্ধে লড়ব কীভাবে? এই প্রশ্নগুলোকে সব সময়ই ধামাচাপা দেওয়া হয়েছে। যারা এই মৌলিক প্রশ্ন তোলার চেষ্টা

www.pathagar.com

করেছেন তাঁদের বলা হয়েছে ইসলামের সঙ্গে আবার মোকাবিলা কি? ইসলাম মাত্রই মৌলবাদী, ভয়ংকর। কী সাংঘাতিক, ইসলামের সঙ্গে আবার মোকাবিলার কথা বলছে। কারা আবার? এরাও নিশ্চয়ই মৌলবাদী'। মৌলবাদীদেরই দোসর। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীতার ধারা এই দিক থেকে নোংরা গলির রকবাজ খিস্তিখেউড়গিরির অধিক অগ্রসর হতে পারেনি।

একাত্তরের ঘাতক, খুনি রাজাকার বা ধর্ষক হিসেবে বিচারের ক্ষেত্রেও প্রবল ব্যর্থতা রয়েছে। জামায়াত-শিবিরের অনুসারীদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার আগে শেখ মুজিবুর রহমান তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি গণআদালত ও বিচারের নামে তামাশা ও শস্তা রাজনীতির ফায়দা লুটবার প্রচেষ্টা করেছে এবং আজো করে যাচ্ছে। আসলে বিচারের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু বিচার কেউই চায়নি। কারণ সেটা সহজ কাজ ছিল না। গণআদালতে বিচার করবে যারা তারা তা কার্যকর করবে না। কী আনন্দ! সেটা বাস্তবায়ন করবে বিএনপি-এটা যেন মামাবাড়ির আবদার। এই চূড়ান্ত তামাশা ছাড়া গণআদালতের অভিনয় আমাদের জন্য আর কোনো সুফল বয়ে আনেনি। যদি বিচার করার মুরোদ থাকে তবে সেটা কার্যকর করার মুরোদ ছিল না কেন? যদি আদালতে বিচারক হিসেবে বসার খায়েশ হয়ে থাকে তাহলে গোলাম আযমের ফাঁসি কার্যকর করার প্রশ্নে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আচরণ ইঁদুরের মতো হয়ে গেলো কেন?

বাংলাদেশের জামায়াত-শিবিরকে ধর্ম ব্যবসায়ী বলে গালিগালাজ করে আমরা মনে পরিতোষ লাভ করতে পারি। কিন্তু 'ধর্ম ব্যবসায়ী' মূলত আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী নয়। কারণ ধর্ম তার রাজনীতির বাইরের জিনিস নয়, তার ভেতরের জিনিস। ওটা তার ব্যবসা নয়, বা ধর্ম দেখিয়ে সে লোকের মন জয় করতে চাইছে না। বরং ধর্ম প্রতিষ্ঠা করাই সে তার কর্তব্য বলে গণ্য করে। ইসলামের যে ব্যাখ্যা সে দাঁড় করায় সেটা তার নিজের। কিন্তু তার ব্যাখ্যাটাই সঠিক ও সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করার জন্য রাজনীতি করছে। মাথায় কালোপট্টি বাঁধা বা অতি মুসলমান সাজা ধর্ম ব্যবসায়ীদেরই সাজে। জামায়াত-শিবির ইসলাম ধর্ম কায়েম করার জন্য রাজনীতি করছে। ধর্ম সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যা আমাদের গ্রহণ করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু সেটা যে একান্তই তাদের মনগড়া ব্যাখ্যা সেটা তো অন্তত প্রমাণ করে দেখাতে হবে। এটা যে একটা রাজনৈতিক লড়াইয়ের অংশ সেটা আমরা ঘূর্ণাক্ষরেও ভাবিনি। এখনো ভাবি না।

ধর্ম এবং রাজনীতির ভেদ জামায়াত-শিবির মতাদর্শিকভাবে মানে না। রাজনীতি ও রাষ্ট্রে এই ভেদ রক্ষা জরুরী কেন সেই রাজনৈতিক-দার্শনিক বিতর্ক বাংলাদেশে এখনো হয়েছে বলে আমার চোখে পড়েনি। কারণ এসব তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজনীয়তাকে আমরা পরিকল্পিতভাবে উপেক্ষা করেছি। আমরা ধরে নিয়েছি আমরা এইসব সকলেই জানি এবং বুঝি। অথচ বাস্তবতা তার ঠিক উল্টো।

তর্কের খাতিরে কেউ বলতে পারেন যে, জামায়াত-শিবির যে ইসলাম কায়েমের কথা বলছে সেটা আসল ইসলাম নয়। মওদুদী-গোলাম আযমের ইসলাম। ভালো কথা। তাহলে আসল

www.pathagar.com

ইসলাম কী এবং তা কায়েম করা আদৌ দরকার আছে কিনা সে বিষয়ে বিতর্ক সমাপ্ত না করে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনীতির বিকাশ কী করে সম্ভব? এই তর্কের মীমাংসা ইউরোপে এক রকমের হয়েছে, আমরা ইউরোপকে অনুকরণ করতে গিয়ে যদি ধরে নেই যে, ইসলামের সঙ্গে আমাদের মোকাবিলা শেষ হয়েছে তাহলে আমরা ভয়াবহ ভুল কবর। আজ পর্যন্ত মওদুদী, গোলাম আযম কিংবা জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য বিতর্ক বা লেখালেখি হয়েছে তার নজির চোখে পড়েনি। অন্য কারো পড়েছে কিনা জানি না। আমি অন্তত চোখে দেখিনি।

হতে পারে যে, পরিকল্পিতভাবে জামায়াত-শিবিরকে ঘাতক, দালাল, রাজাকার ও খুনি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই আজ অবধি জামায়াত-শিবির বিরোধী রাজনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই ধারার কোনো মতাদর্শিক অবস্থান আছে সেটা স্বীকার করে নেওয়াও বিপজ্জনক বলে অনেকে মনে করেছেন। সেটা কৌশল হতে পারত, কিন্তু নীতি নয়। কারণ ধর্মের সঙ্গে রাষ্ট্রে এবং সমাজ ও সংস্কৃতির সম্পর্ক কী- এসব অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্ন। হয়তো স্বাধীনতার পর পর একটা পর্যায় পর্যন্ত জামায়াত-শিবিরের প্রতি এই কৌশল অবলম্বন ভুল ছিল না। কিন্তু এখন স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, এই কৌশল নিজের ফাঁদে নিজেই আটকা পড়েছে। ধর্মের সঙ্গে কোনো নীতিগত বিতর্কে জড়াব না এই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ভয়াবহ রকম মার খেতে বাধ্য। তথাকথিত গণতন্ত্রী ও প্রগতিশীলদের ধারণা যে, ধর্মের সঙ্গে মাখামাখি না করলেই সমস্যা আপসেআপ আপনা আপনি চুকে যায়। কিন্তু ব্যাপারটা তো অত সহজ নয়। আমার যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাব না- এই প্রকার নীতি ধর্মের প্রশ্নে কী মারাত্মক রূপ নিতে পারে বাংলাদেশ তার একটি উৎকৃষ্ট নজির। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কী সম্পর্ক, কী সম্পর্ক ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির? বিশেষত ইসলাম-প্রধান দেশগুলোতে গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল রাজনীতি বিকশিত করার বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক শর্তগুলো বিচার করা একটা জরুরী কাজ হিসেবে আমাদের কাঁধে এসে পড়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে বেশ দেরি হয়ে গেছে। সেদিকেই দুই একটি ইঙ্গিত দিয়ে আমার কথা শেষ করব।

তিন.

জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে আওয়ামী হুংকার বিরোধী জোটকে শুধু শক্তিশালীই করবে না, বরং সেই জোটে জামায়াত-শিবিরের অবস্থান আরো শক্তিশালী হবে। সমাজের রাজনৈতিক মেরুকরণ ক্রমশ ধর্মীয় ভেদবুদ্ধি অনুসরণ করবে, যার পরিণতি বাংলাদেশের জন্য ভালো হবে না। আগামী নির্বাচনে তার কিছু প্রমাণ আমরা পাব। তার মানে যে রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি এবং সংস্কৃতির সম্পর্ক বিচার করার পরিবেশ বহাল থাকে, সেই পরিবেশ থাকবে না। এছাড়াও আওয়ামী লীগকে আরো কিছু গুরুতর সংকটের মোকাবিলা করতে হবে।

ভারত বাংলাদেশের সীমান্তে একটি ছোটখাটো যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। সীমান্তে ভারতীয় বহিনীর অনুপ্রবেশ এবং ক্রমাগত সশস্ত্র হামলা, লুণ্ঠন, অপহরণ ও হত্যা নিন্দনীয়। প্রশ্ন

www.pathagar.com

হচ্ছে ভারতের এই আচরণের প্রতি আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গিটা কী? ভারত কেন আওয়ামী শাসনের সময়েই এই সশস্ত্র হামলার নীতি বেছে নিল সেটাও পরিষ্কার নয়। তাহলে কি বিএনপি, জামায়াত, জাতীয় পার্টির নতুন জোটই ভারতের শাসক শ্রেণীর অধিক, পছন্দের? আওয়ামী লীগ ভারতের স্বার্থ সংরক্ষক কথাটি কি তাহলে নিছকই অপপ্রচার? এটা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, সাইফুর রহমান সাহেব যখন অর্থমন্ত্রী ছিলেন তখনই তিনি বাংলাদেশকে ভারতীয় পণ্যের বাজারে পরিণত করেছিলেন। তবুও ফারাক্কার পানি বন্টন ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধানের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের যে ভারতনীতি জনগণ প্রত্যক্ষ করেছে, কিংবা বিএনপি-জামায়াতের প্রচারে বিশ্বাস করেছে, সেটাই এখন পাকাপোক্ত হযে উঠছে। আমি আওয়ামী লীগের পানি বন্টন চুক্তি ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের সঙ্গে একমত নই। কিন্তু বিএনপি'র বিরোধীতারও সমর্থক নই। আমি মনে করি না বিএনপি, 'ভারতবিরোধী' এবং আওয়ামী লীগ 'ভারতপন্থী'। মূলত জাতীয় পার্টি এবং বিএনপির রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকার সময় এবং তাদের রাজনীতির মধ্য দিয়েই ভারতের শাসক ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থ আওয়ামী লীগের তুলনায় অনেক বেশি রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ বাস্তবিকই ব্যর্থ, এটাই তার চরম ও পরম ভাবমূর্তি হয়ে উঠছে।

দ্বিতীয়ত, বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 'হিন্দুত্ব', যাকে পর্যবেক্ষকরা পুঁজিতান্ত্রিক গোলোকায়নের (Globalization) এই যুগে বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত নব্য ফ্যাসিবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করছেন, তার প্রতি আওয়ামী নীতি কী? ভারতের শাসকশ্রেণীর সঙ্গে সম্পর্কের প্রশ্ন আর 'হিন্দুত্ব', মোকাবিলার প্রশ্ন এক নয়। হিন্দুত্বের সঙ্গে সম্পর্ক আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদের বা পুঁজিতান্ত্রিক গোলোকায়নের। তার সমর্থক শুধু ভারতে নেই। এর শক্তির উৎস বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, যার শক্তি ভারতের শাসক ও শোষক শ্রেণীর চেয়েও অনেক অনেক বেশি। আওয়ামী লীগ কি হিন্দুত্বের স্বার্থ রক্ষাকারী? এই প্রশ্ন করা আওয়ামী লীগের প্রতি অবিচার করা হবে। কিন্তু এই বিজেপি ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 'হিন্দুত্বের' বিরুদ্ধে জনগণের স্বার্থরক্ষা করার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নীতি কী? এই প্রশ্নগুলো মোকাবিলা না করে সম্প্রতি কলকাতার আনন্দবাজার গোষ্ঠীকে এই দেশে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়ে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিকভাবে নিজের পায়ে কুঠার মারার নীতি অবলম্বন করেছে। অথচ আমরা বলতে পারছি না আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে বিএনপির নেতৃত্বাধীন বিরোধীদলীয় জোট ক্ষমতায় এলে আমাদের জন্য ভালো হবে। অন্যদিকে আওয়ামী শাসন আমাদের জন্য তাদের পুরনো শাসনকালের চেয়েও অসহ্য হয়েছে। দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এলে আমাদের কলিজায় আর পানি অবশিষ্ট থাকবে কিনা সন্দেহ। এই শাঁখের করাত অবস্থা থেকে আমাদের কি কোনো নিস্তার নেই?

জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে আওয়ামী যুদ্ধের পরিণাম কী দাঁড়ায় বলতে পারব না। কিন্তু রাজনৈতিক দিক থেকে আওয়ামী লীগের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে দ্রুত। আওয়ামী লীগে কি এই ক্ষয় অনুধাবনের শক্তি কারো আছে? কে জানে!

আওয়ামী লীগ ব্যর্থ হতে পারে কিন্তু জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে লড়ার সঠিক নীতি ও

www.pathagar.com

কৌশল নির্ধারণের এখনই বোধহয় ভালো সময়।

শ্যামলী, ২ শ্রাবণ ১৪০৭

ফরহাদ মাযহার : কবি, লেখক ও প্রাবন্ধিক।

প্রথম আলো- ২২/৭/২০০০

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট, মৌলিক মানবাধিকার

শেখা হাসিনা কিছুদিন আগে মন্তব্য করেছিলেন জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করা না করার ব্যাপারটা জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করছে। তিনি ঠিক কী বলেছেন সেটা জানি না। কারণ তার কথা পড়েছি পত্রিকায়। পত্রিকায় খবর দেখে মনে হলো, তিনি জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করতে চান। তবে মুখ রক্ষার জন্য চান যে 'জনগণ' নিষিদ্ধ করার দাবিটা তুলুক।

এই খবরের পরপরই হঠাৎ শুনলাম, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট মহাসম্মেলন করতে যাচ্ছে। এই গরমের সময় হঠাৎ এই সম্মেলনের কথা শুনে মনে প্রশ্ন জাগল, কেন হঠাৎ এই সম্মেলন? একদিকে সন্ত্রাস, হত্যা ও গৃহযুদ্ধের হুমকি, অন্যদিকে ডেঙ্গুজ্বর- কোনো কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ এই কাতর পরিস্থিতিকে সাংস্কৃতিক সম্মেলনের জন্য উপযোগী বলে মনে করতে পারেন না। তবে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের যারা নেতৃবৃন্দ তারাই ভালো জানেন এই সময়টা কেন বেছে নেওয়া হলো।

যে সন্দেহ করেছি সেটাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার দাবি তুলেছে। বোঝা গেল তারা তাদের প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডাকে সাড়া দিয়েছে। তবুও মনে সন্দেহ জাগল ব্যাপারটি সংস্কৃতি কর্মীদের মনের কথা কিনা। পরে খবর নিয়ে জানতে পারলাম শেখ হাসিনা সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতাদের সম্মেলনের আগে নিজের কাছে ডেকেছিলেন এবং জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ করার দাবি তোলার নির্দেশ দিয়েছেন। আওয়ামী লীগের বশংবদের মতো সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ঠিক তাই করেছে। এখন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের এই ঘোষণাকে 'জনগণের দাবি' হিসেবে আখ্যায়িত করে শেখ হাসিনা কখন জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট সংস্কৃতির সেবা করার পরিবর্তে আওয়ামী লীগেরই সেবা করেছে এটা কোনো নতুন খবর নয়। এটাই এই জোট এতকাল করে এসেছে। আওয়ামী লীগ যখন বিএনপিকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে আঁতাত গড়ে তুলেছিল, তখন কিন্তু জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার দাবি ওঠেনি। নিদেনপক্ষে আওয়ামী লীগের এই সুবিধাবাদী রাজনীতির ভয়াবহ পরিণামের জন্য সাবধান করা কর্তব্য ছিল। একইভাবে মহাসম্মেলন ডেকে আওয়ামী লীগের নিন্দা জানানো যেত। কিন্তু তখন জামায়াত-শিবিরকে বৈধ ও রাজনৈতিকভাবে পুনর্বাসিত করার এই প্রক্রিয়াকে নীরবে সমর্থন জানিয়ে গিয়েছে আওয়ামীপন্থী এই সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। এখন শেখ হাসিনাকে তুষ্ট করবার

www.pathagar.com

জন্য জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার ডাক দেওয়া হয়েছে। একটি দলের এই ধরনের নগ্ন লেজুড়বৃত্তি আদৌ সংস্কৃতিপদবাচ্য কিনা সেটা দেশের কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন নাগরিকরাই বিচার করে দেখবেন।

কিছু পাঠকের হয়তো মনে থাকতে পারে, বহু বছর আগে গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা উচিত কিনা সেই প্রসঙ্গে একটা বিতর্ক তৈরির চেষ্টা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে গণতন্ত্র, সংবিধান, রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা উঠেছিল। যদ্দূর মনে পড়ে 'ভোরের কাগজ' পত্রিকায় সাজ্জাদ শরিফ এই চেষ্টাটি আন্তরিকভাবে করেছিলেন। কারণ বিষয়টি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল শক্তির পক্ষে আমার বক্তব্য ছিল, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জামায়াত-শিবির বা ইসলামী শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন নামক রাজনৈতিক দল একটি স্ববিরোধিতা। যে দল গণতন্ত্রকেই নস্যাৎ করতে চায় তাকে দল গঠন করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের অধিকার দেওয়া কি আদৌ 'গণতন্ত্র'? এটাই ছিল আমার প্রশ্ন। তাহলে কী ধরনের রাজনৈতিক দল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনীতি করার অধিকার পেতে পারে, সাংবিধানিকভাবে কারা পেতে পারে না- এই বিতর্কগুলোর মীমাংসা ছাড়া গণতন্ত্রের বিকাশ সম্ভব নয়।

আমার মনে আছে, আমার বন্ধু আহমদ ছফা আমার বিরোধিতা করেছিলেন মত ও চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতার পক্ষাবলম্বন করে। অবশ্যই তার যুক্তি ছিল। মত ও চিন্তা প্রকাশের স্বাধীনতার দিক থেকে তরুণ কার্ল মার্কসের লেখালেখি পাঠ করলে দেখা যায়, তিনি আহমদ ছফার পক্ষেই রায় দেবেন। কিন্তু আমার চিন্তা বা মতের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলছিলাম না। অর্থাৎ আরো সুনির্দিষ্টভাবে ইনকিলাব বা সংগ্রাম পত্রিকা নিষিদ্ধ করা না করা নিয়ে বিতর্ক করছিলাম না। সেই ক্ষেত্রে আহমদ ছফারই জয় হতো। আমাদের তর্ক ছিল, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দল হিসেবে কারা ক্ষমতা দখলের জন্য কর্মকান্ড চালাবার ক্ষেত্রে বৈধ বলে বিবেচিত হবে, কারা নয়। বলা বাহুল্য, পত্রপত্রিকা আর রাজনৈতিক দল এক কথা নয়।

এগুলো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশের ক্ষেত্রে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক। এ ধরনের বিতর্ককে ধামাচাপা দিলে আখেরে পরিণাম ভালো হয় না। বাংলাদেশ তার উৎকৃষ্ট নজির।

কিন্তু যখন যে তর্ক আমাদের তোলা দরকার সেই তর্ক আমরা তুলি না, তুলবার কর্তব্যটুকুও আমরা বোধ করি না। অথচ এখন জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হচ্ছে। এমন সময় এই দাবি তোলা হচ্ছে, যখন শুধু মাদ্রাসার ছাত্র হবার কারণে আমাদের সন্তানদের ওপর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস লেলিয়ে দিয়েছে। কেন? এরা গরীব আর মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান বলে? যখন একটি লাশ পড়লে দশটি লাশের জন্য প্রতিজ্ঞা উচ্চারিত হয়েছে, যখন নিরীহ নাগরিকদের পিটিয়ে হত্যা করা হচ্ছে, এই অপরাধে যে সে জামায়াত-শিবিরের সমর্থক, তখনই জামায়াত-শিবির নিষিদ্ধের দাবি তোলা হলো। প্রতিপক্ষকে খুনের পিপাসায় টুপি পাঞ্জাবী লুঙ্গি পরা প্রতিটি নাগরিককেই এখন হরকাতুল জেহাদের সদস্য বলে

www.pathagar.com

সন্দেহ করা হচ্ছে। এই নগ্ন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ও মৌলিক মানবাধিকারের পক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোই সুস্থ নাগরিকের প্রথম কর্তব্য। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা ছাড়া গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নাগরিকদের আর কী পথ আছে? ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ও বিজয় অর্জন করেই আমাদের জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি করার অধিকার আছে কি নেই সেই গণতান্ত্রিক বিতর্কে অংশগ্রহণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। নইলে আমরা ফ্যাসিবাদী শক্তির সমর্থক ও পরিপোষকে পরিণত হব। যারা জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি করার সাংবিধানিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার আছে কি নেই সেই বিষয় নিয়ে সঠিক সময়ে তর্কের চেষ্টা করেছিলেন, তাদের সেই চেষ্টা এক হিসেবে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক তর্ক-বিতর্কের মধ্য দিয়ে যে সমষ্টিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাতে আমরা অভ্যস্ত নই। যারা লেখালেখি করেন কিংবা সংস্কৃতির দোহাই পাড়েন তাদের অধিকাংশই দলীয় লেজুড়বৃত্তিতে ব্যস্ত। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যখন দ্রুত ঘোলাটে ও অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তখনো বিতর্কের নামে প্রতিপক্ষকে গালিগালাজ এবং পাঠকের ওপর দীর্ঘ ও বিরক্তিকর কূটতর্কের অত্যাচার ছাড়া অধিক কিছু কি এখন দেখা যাচ্ছে? বোধ হয় না।

জামায়াত-শিবির সম্পর্কে তর্কের জায়গাটা কী? গণতন্ত্রে বা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যদি কোনো রাজনৈতিক দল মনে করে জনগণ সার্বভৌম নয়- বা আরো সোজা কথায় সাংবিধানিক, আইনি, প্রশাসনিক শক্তি বা রাষ্ট্রশক্তির বৈধতার ভিত্তি জনগণ নয় বরং কোনো আসমানী, ঐশ্বরিক বা দৈব বিধান- তাহলে সেই দলকে কি রাজনৈতিক দল হিসেবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সক্রিয় থাকতে দেওয়া উচিত? জামায়াত-শিবির কিংবা ধর্মপন্থী কোনো দল যদি মনে করে তারা আল্লাহর বিধান কায়েম করবে, জাতীয় সংসদে প্রণীত আইন তাদের কাছে বৈধ নয়, কিংবা জাতীয় সংসদ মানুষের জন্য কোনো বিধান বা আইন প্রণয়নের বৈধ অধিকারী নয়, তাহলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তাদের স্থান কোথায় হবে? যদি তারা জনগণের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস না করে তাহলে তাদের সঙ্গে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী অবৈধ নয়। রাজনৈতিক দল ক্ষমতার জন্য লড়ে। সেই লড়াই যদি আদর্শভিত্তিক হয় তাহলে সেই দলের বিজয় মানে একইভাবে সেই আদর্শেরও বিজয়। জামায়াত-শিবির যদি ক্ষমতা দখল করতে পারে, কিংবা রাজনৈতিকভাবে জয়ী হয় তাহলে সেটা কোরআন-সুন্নাহভিত্তিক সংবিধান ও আইন কায়েমের বিজয়, গণতান্ত্রিক আদর্শের পরাজয়। মানুষের সংবিধান নয়, কোরআন-হাদিসই হবে সকল আইনের ভিত্তি ও মানদণ্ড। তাহলে গণতন্ত্র মানে কী? গণতন্ত্রের পক্ষে কি এমন কোনো স্ববিরোধী ব্যবস্থা টিকে থাকতে পারে, যেখানে একটি রাজনৈতিক দল খোদ গণতন্ত্রকেই নস্যাৎ করবার জন্যই মতের স্বাধীনতার নামে দল গঠন করতে পারে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উৎখাতের জন্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালাতে পারে?

উত্তর খুবই স্পষ্ট। গণতান্ত্রিক সংবিধান এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সংবিধান অবশ্যই নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারতে পারে না। অতএব জনগণই সার্বভৌম, সকল ক্ষমতার উৎস বা ভিত্তি; অন্যদিকে ধর্মবিশ্বাস যার যার নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার- এই মৌলিক নীতি ছাড়া গণতন্ত্র

www.pathagar.com

অসম্ভব। এই নীতির বিরোধিতা যারা করে, যারা এই নীতিকে নস্যাৎ করতে উদ্যত কিংবা এই নীতির ধ্বংস সাধনই যাদের রাজনীতি তাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দল গঠন ও রাজনৈতিক তৎপরতা চালাতে দেওয়া চরম আহম্মকি ছাড়া কিছুই হতে পারে না।

কিন্তু এখনকার এই খেলা বা তামাশা তাহলে আমাদের দেখতে হচ্ছে কেন? জামায়াতে ইসলামী দল হিসেবে কীভাবে সাংবিধানিক বা আইনগত স্বীকৃতি পেল? আবার এখন সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ করার দাবিটাও বা উঠেছে কেন? তামাশার গোড়া কি এমন কোনো অপ্রকাশ্য বা অদৃশ্য জায়গায়, যার কারণে ব্যাপারটা সহজে জনগণের নজরে পড়ে না? কী রহস্য সেই গোপন স্থানে? গোড়াটা সাধারণ নাগরিকদের যেন নজরে না পড়ে তার জন্য সবসময়ই আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি কি সচেষ্ট?

অবশ্যই। কারণ জনগণ সার্বভৌম-এটাই যে গণতন্ত্রের মর্ম, ভিত্তি বা শর্ত এটা জামায়াতে ইসলামী যেমন বিশ্বাস করে না, তেমনি আওয়ামী লীগ, বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি আমাদের ক্রমাগত বোঝাবার চেষ্টা করে যে, গণতন্ত্র মানে নিছকই ভোটাভুটির ব্যাপার। জনগণ যদি সার্বভৌম হয় তাহলে জনগণের মৌলিক মানবিক বা গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করার অধিকার কোনো দলের তো নয়ই, কোনো জাতীয় সংসদের থাকতে পারে না। কিন্তু সব কটি দলই এই ক্ষেত্রে জনগণের কাঠগড়ায় আসামি। কিন্তু সেটা রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য কোনো ব্যাপারই নয়। গণতন্ত্র বলতে তারা একটি মাত্র ধারণাই আমাদের দেবার চেষ্টা করে- সেটা হলো, কয়েক বছর পরপর আমরা তাদের মধ্য থেকে ধরে ধরে একেকটা চোর, ঋণখেলাপী, ডাকাত, সন্ত্রাসী ও সমাজবিরোধীকে আপনাদের হাড়মাংসমজ্জা ভেজে খাবার জন্য ভোট দিয়ে নির্বাচন করব। ভোটাভুটির খেলা খেলে আমাদের ঘাড় মটকিয়ে কতটা রক্ত কে কতটা শোষণ করতে পারে সেই প্রতিযোগিতাই নাকি গণতন্ত্র!

কিন্তু সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এটা মনে করে না। তারা শুধু জামায়াত-শিবিরকেই নিষিদ্ধ করতে চায় এবং আওয়ামী লীগের অনুগত থেকে আরো ননীমাখন খেতে চায়। শেখ হাসিনা কোন গণতান্ত্রিক অধিকার বলে একটি লাশের পরিবর্তে দশটি লাশ চেয়েছেন? কোন অধিকারের বলে চট্টগ্রামে আন্দরকিল্লায় মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে ফেরার পথে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা অমানুষিক নির্যাতন করে একজন ব্যবসায়ীকে হত্যা করল? এই মানুষটি হয়তো জামায়াত-শিবির করে কিন্তু সে কি চট্টগ্রামের আট খুন মামলায় জড়িত? যদি জড়িত থেকে থাকে হত্যা করার অধিকার ছাত্রলীগের কর্মীদের কে দিয়েছে? কী অধিকারের বলে দারুল উলুম আলিয়া হোস্টেলে পুলিশ হামলা করেছে? কোন অধিকারে রাজশাহীতে ৩৮ জন শিবির কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে? এরা কি সকলেই আট খুনের সঙ্গে জড়িত? এরা কি সকলেই অপরাধী? জামায়াতে ইসলামীর সদস্য হওয়া কি ইসলামী ছাত্রশিবির করা কি বাংলাদেশের আইনে অপরাধ?

জামায়াত-শিবিরের যারা সদস্য বা সমর্থক তাদের কাছে গণতন্ত্র কেবল তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন গণতন্ত্র তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। সেটা হলো, নাগরিকদের মৌলিক মানবিক অধিকার ও রাষ্ট্রী সন্ত্রাসের হাত থেকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়া। নাগরিকদের মৌলিক নাগরিক অধিকার হরণ করার কোনো অধিকার আওয়ামী লীগ বা পুলিশের নেই।

www.pathagar.com

এমনকি রাষ্ট্রের কোনো অঙ্গেরই এই অধিকার থাকতে পারে না। জামায়াত-শিবির প্রতিরোধের নামে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে ধ্বংস করার এই চেষ্টা আমরা হিটলার এবং মুসোলিনীর আমলে দেখেছি। তাদের সমস্ত ক্রোধ ছিলো ইহুদীদের ওপর। ধরে ধরে তারা ইহুদিদের মেরেছে। কনসেট্রেশন ক্যাম্পে তাদের পুড়িয়েছে। জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে সেই একই কায়দায় ফ্যাসিবাদী হামলা শুরু হয়েছে। শ্লোগানগুলোও হিটলার এবং মুসোলিনীর আমল স্মরণ করিয়ে দেয়। 'একটা/দুটা শিবির ধর/সকাল বিকাল নাস্তা কর', 'ধর ধর শিবির ধর, ধরে ধরে জবাই কর।' যে কোনো গণতান্ত্রিক ব্যক্তি জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও সামরিক সংগ্রামে সংকল্পবদ্ধ হতে পারেন। জামায়াত-শিবিরের রাজনৈতিক-সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই প্রস্তুতি ও প্রচারের প্রয়োজন রয়েছে। কিন্ত জামায়াত-শিবির প্রতিরোধের নামে যেটা চলছে তাকে নির্জলা ফ্যাসিবাদ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটে কবি শামসুর রাহমান এবং কবীর চৌধুরীর মতো বয়স্ক মানুষরাও ছিলেন। মাননীয় শামসুর রাহমান, আপনি কি সেই প্রশ্ন শেখ হাসিনাকে করেছেন যে, একটি লাশের পরিবর্তে ১০টি লাশ চাওয়া কী ধরনের সংস্কৃতি? আপনি কি এই ফ্যাসীবাদীর উন্মত্ততার বিরুদ্ধে এক অক্ষর প্রতিবাদ জানিয়েছেন? আপনাকে বলছি, কারণ বয়সে, যোগ্যতায়, মানুষের কাছ থেকে পাওয়া ভালোবাসার শক্তিতে আপনি যেখানে আছেন সেখান থেকে আপনারই হুঙ্কার দিয়ে বলা উচিত ছিল, এ কী করছেন প্রধানমন্ত্রী? এটা তো ফ্যাসীবাদী সংস্কৃতি, এটা তো খুনের সংস্কৃতি। এক লাশের পরিবর্তে ১০ লাশ তো আপনি চাইতে পারেন না। এটা তো আইনের শাসন নয়। বলা উচিত ছিল, এই বক্তব্যের পরে তো আদালত থেকে আপনার নামে সমন যাওয়া উচিত এবং বাংলাদেশ আদৌ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কিনা তার পরীক্ষার জন্য আপনার বিচার হওয়া উচিত? বলতে কি পারতেন না যে, জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আইনের লড়াইয়ে আমরা প্রস্তুত, কিন্তু জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নামে নিরীহ নাগরিকদের মৌলিক নাগরিক অধিকার হরণ করার কোনো ক্ষমতা তো আমরা আপনাকে দেইনি? দেশের একজন কবি হিসেবে এটা তো আমি মেনে নিতে পারি না। আপনি কি বলতে পারতেন না? আওয়ামী লেজুড়বৃত্তি এবং তার ফ্যাসিবাদকে সমর্থন করাই কি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একমাত্র পথ? একই কণ্ঠে- যে কণ্ঠে জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা তুলেছেন, সেই একই কণ্ঠে কি ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো সঙ্গত ছিল না আপনার? কেবল তখনই তো সত্যিকারের গণতান্ত্রিক-প্রগতিশীল সংস্কৃতি বিকাশের বীজ আপনি বপন করে যেতে পারতেন। এই নিবন্ধ আমাকে লিখতে হতো না।

আমি বিশ্বাস করি, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করেন এমন মানুষ আছেন। কিন্তু পত্রপত্রিকায় তাদের কণ্ঠস্বর আমরা শুনিনি। আশা করি, তারা সংস্কৃতির নামে ফ্যাসিবাদের পক্ষের শক্তির সম্মেলন ঘটানোর এই প্রদর্শনীতে লজ্জিত হবেন এবং খাঁটি সংস্কৃতিকর্মী হিসেবে গণতন্ত্র ও মৌলিক মানবিক অধিকারের পক্ষে লড়বেন।

শ্যামলী, ১৫ শ্রাবণ, ১৪০৭

ফরহাদ মজহার : কবি লেখক ও প্রাবন্ধিক।

প্রথম আলো ২/৮/২০০০

www.pathagar.com

আওয়ামী ষড়যন্ত্রের আসল লক্ষ্য ঃ ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযান

একটি বৈধ রাজনৈতিক দলকে প্রতিরোধ করার মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের মূল লক্ষ্য কি ইসলামী শক্তিকে ধ্বংস করা?

এলাহী নেওয়াজ খান ॥ স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এই দ্বিতীয়বারের মত আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে একটি বৈধ ও স্বীকৃত রাজনৈতিক দলকে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলো। এর আগে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর গঠিত ঐ একই আওয়ামী লীগ সরকার ধর্মভিত্তিক সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ করেছিল। তবে এবার নিষিদ্ধ না করে খুব কৌশলে 'প্রতিরোধের' নাম করে একটি রাজনৈতিক দলকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করছেন।

গত ১৮ জুলাই সরকার সমর্থক 'দৈনিক বালাবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত লিড নিউজে বলা হয়েছে যে, 'সরকার স্বাধীনতাবিরোধী রাজাকার, আলবদর ও তার অনুসারী জামায়াত-শিবিরকে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজনৈতিক কর্মসূচী এবং আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার মাধ্যমে সরকারের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হবে। গত সোমবার মন্ত্রী সভায় নির্ধারিত বিষয়ে আলোচনার পর দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার পর এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।" এই একই রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, সরকার জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করে বিতর্কে জড়াতে চায় না। কিন্তু চট্টগ্রাম হত্যাকান্ডের ঘটনাকে ইস্যু হিসেবে কাজে লাগিয়ে সারাদেশে তাদের অস্ত্রধারী ক্যাডারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে চায়। গত ১৭ জুলাই সরকার সমর্থক দৈনিক প্রথম আলো'তে 'জামায়াত-শিবিরকে আঘাত করে বিরোধী জোটকে চেপে রাখতে আওয়ামী লীগের কৌশল' শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হবার পরের দিনই মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকে ঐ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ফলে এ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সরকার মূলত আগামী নির্বাচনে তার বিজয় সুনিশ্চিত করার জন্য দেশের গোটা ইসলামী শক্তির ওপর আঘাত হেনে জোটবদ্ধ নির্বাচনের উদ্যোগকে ব্যাহত করতে চাচ্ছে। আর ইতিমধ্যে সরকার সে প্রক্রিয়া শুরুও করেছে। পর্যবেক্ষকরা বলছেন যে, সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে– জামায়াত-শিবিরের নামে এ দেশের ইসলামী দল বা শক্তিকে রাষ্ট্রীয় শক্তির জোরে পর্যুদস্ত করে বিরোধী দলের সেক্যুলার অংশের থেকে আলাদা করে দেয়া। তারা বলছেন, ইতিপূর্বে অনেকবার সরকারের পক্ষ থেকে 'তালেবান' ইস্যু সৃষ্টি করে মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ করার অভিলাষই ইসলামী সংগঠনগুলোকে ধ্বংস করার উদ্যোগ নিয়ে ব্যর্থ হওয়ার পর এখন মন্ত্রী পরিষদে সিদ্ধান্ত নিয়ে ইসলামী শক্তিকে নির্মূল করার আনুষ্ঠানিক উদ্যোগ নেয়া হলো। যেভাবে যে ইস্যুকে কেন্দ্র করে মন্ত্রী পরিষদে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তাতে সরকারের অভিপ্রায় বুঝতে আর কারো অসুবিধা হচ্ছে না। 'বাংলাবাজারের' রিপোর্ট অনুযায়ী সরকার চট্টগ্রাম হত্যাকান্ডের ঘটনাকে ইস্যু হিসেবে কাজে লাগিয়ে সারাদেশে জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। চট্টগ্রামের যে হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে সরকার জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে হত্যাকান্ডটির তদন্ত এখনো শেষ হয়নি। আর তদন্ত শেষ না হওয়ার আগে 'আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার দৃঢ় অঙ্গীকারবদ্ধ এই সরকার কিভাবে ঐ সিদ্ধান্ত নিলেন– সে প্রশ্ন দেশের প্রত্যেক সচেতন মানুষের মনে জেগে উঠেছে। তদন্তকারী সিআইডি কর্মকর্তারা তো বলেছেন, ছাত্রলীগের কোন গ্রুপ ঐ হত্যাকান্ডে জড়িত আছে কিনা সেটাও তারা খতিয়ে দেখবে।' আর সেটাই যদি হয় এবং তদন্তে যদি প্রমাণিত হয় যে, ঐ হত্যাকান্ডটি ছাত্রলীগের আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয়েছিল, তাহলে কি সরকার ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন? নাকি সরকার তার রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য তদন্ত প্রভাবিত করে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য আগেভাগে মন্ত্রি পরিষদে ঐ সিদ্ধান্ত নিয়েছে? পর্যবেক্ষকরা বলছেন, সরকার যদি সত্যিই আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি করতে চায়, তাহলে চট্টগ্রামের হত্যাকান্ডকে একটি সন্ত্রাসী ঘটনা হিসেবে তদন্ত করা উচিত। তা না করে সরকার কেন এটাকে ইস্যু হিসেবে কাজে লাগিয়ে একটি রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে সচেতন মহলের প্রশ্ন হচ্ছে যে, সত্যিই যদি শিবিরের ছেলেরা ঐ হত্যাকান্ড সংঘটিত করে থাকে এবং এটা তদন্তে প্রমাণিত হয়, তাহলে এটাকে ইস্যু হিসেবে কাজে লাগাতে চাচ্ছে কেন সরকারী মহল? তাহলে কি সরকার নিশ্চিত যে, ঐ ঘটনা তাদের আভ্যন্তরীণ– এটাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে ইস্যু হিসেবে কাজে লাগাচ্ছে?

মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্তের সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ দিকটি হচ্ছে যে, 'সরকার' 'রাজাকার', 'আলবদর' ও তার অনুসারী জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক কর্মসূচী ও আইনগত ব্যবস্থা নেবে। রাজনৈতিক কর্মসূচীটা সবার বোধগম্য। অর্থাৎ সরকার জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে সারাদেশে ব্যাপক প্রচারাভিযান শুরু করবে। কিন্তু আইনগত ব্যবস্থাটা কি? এ ব্যবপারে কোন ব্যাখ্যা বাংলাবাজারের রিপোর্টে দেয়া হয়নি। এখানেই সরকারের গোপন অভিসন্ধিটি লুকিয়ে আছে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন।

পর্যবেক্ষকদের অভিমত হচ্ছে, আইনগত ব্যবস্থা বলতে হয় সারাদেশে জামায়াত-শিবিরের নেতাকর্মীদের নানা মামলায় জড়িয়ে গ্রেফতার করে জেলে ঢুকিয়ে দেয়া, নতুবা 'যুদ্ধাপরাধীদের' বিচারের নামে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সরকার যদি এ ধরনের আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের উদোগ নিয়ে থাকে, তাহলে সেটা আর জামায়াত-শিবিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না বলে পর্যবেক্ষকদের ধারণা। আর সেটা যদি করা হয় তাহলে সেটা হবে বাংলাদেশের ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে একটা সুদূরপ্রসারী এক গভীর ষড়যন্ত্র। সচেতন মহলের ধারণা, সরকার সেদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে চূড়ান্ত একটি আঘাত হানার জন্য।

এদিকে একটি বৈধ রাজনৈতিক দলকে প্রতিরোধ করার মন্ত্রিপষিদের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তের কারণে এদেশের গণতন্ত্রের ভবিষ্যত নিয়েও সর্বমহলে শঙ্কা দেখা দিয়েছে। সবাই প্রশ্ন করছেন যে, বিশ্বের কোন গণতান্ত্রিক দেশে কি পার্লামেন্টে নির্বাচিত সদস্য আছে, এমন কোন একটি দলকে প্রতিরোধ করার জন্য মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের নজির আছে? সম্ভবত আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বিশ্বের কোন দেশে এ ধরনের নজির নেই। সাধারণত বিভিন্ন দেশে এসব সংগঠন প্রচলিত আইন ও সংবিধান বহির্ভূত পন্থায়

www.pathagar.com

গোপনভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা চালায় তার বিরুদ্ধে এ ধারনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশেও এ ধরনের নিষিদ্ধ ঘোষিত গোপন রাজনৈতিক দল রয়েছে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী তো সে ধরনের কোন সংগঠন নয়। বরং জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালের পার্লামেন্টে, '৯১ সালের পার্লামেন্টে এবং সর্বশেষ '৯৬ সালের পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করছে। শুধু তাই নয়, আজকের আওয়ামী লীগ বিএনপি সরকারবিরোধী আন্দোলনে জামায়াতকে সাথে নিয়ে একজোট হয়ে আন্দোলন করেছে। একসাথে লিয়াজোঁ কমিটির বৈঠকে বসে আলোচনা করেছে, খাওয়া-দাওয়া করেছে। এমনকি তখন জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের সাথে আওয়ামী লীগ নেতাদের একের পর এক বৈঠক করতেও সামান্য দ্বিধাবোধ হয়নি। তাহলে আজ কেন আওয়ামী লীগ জামায়াতের বিরুদ্ধে সংবিধানবিরোধী তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে? এর জবাব একটিই– সেটা হচ্ছে, জামায়াত এখন আর আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে না। অর্থাৎ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করলেই সব ঠিক আছে আর সমর্থন না করলেই রাজাকার-আলবদর। এখন এটা যদি আওামী লীগের রাজনীতি হয়ে থাকে, তাহলে তো আওয়ামী লীগ তার বিরোধী সকল দলের বিরুদ্ধে পর্যায়ক্রমে একই ব্যবস্থা নেবে। অর্থাৎ পার্লামেন্টে একদলীয় শাসন কায়েম না করে বিরোধী দলসমূহকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে কার্যত গণতন্ত্রের আবরণে এক দলীয় শাসন কায়েম করা। তবে বর্তমানের গণতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থায় কি সে লক্ষ্য হাসিল করা ক্ষমতাসীনদের পক্ষে সম্ভব হবে? কিংবা ক্ষমতাসীনরা কি মনে করেন, দমন-পীড়নের মাধ্যমে ক্ষমতা চিরস্থায়ী করা যায়? সম্ভবত ক্ষমতাসীনদের নীতি-নির্ধারকরা কোন মহল দ্বারা ভুল পথে চলছেন? কিংবা সরকারের নীতি-নির্ধারকরা কি মনে করছেন যে, এই ধরনের প্রক্রিয়ায় তারা আগামীতে রাজনৈতিক সাফল্য লাভ করবেন? হয়তো বিরোধী দলের শক্তিশালী কোন অংশের সাথে এমন কোন আঁতাত রয়েছে, যে কারণে সরকার সাফল্যের ব্যাপারে খুবই দৃঢ়।

আর সে কারণেই হয়তো সরকার মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে একটি রাজনৈতিক দলকে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দৈনিক ইনকিলাব ২০/৭/২০০০

বাংলাদেশ থেকে ইসলামী মূল্যবোধ উৎখাতের সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্র মাদ্রাসা শিক্ষা বাতিল স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও অর্পিত সম্পত্তি ফেরত দেয়ার দাবি একই সুতোয় গাঁথা

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ সীমান্তের ওপার থেকে চালান করে দেয়া নীলনকশা অনুযায়ী শাসকগোষ্ঠী এবার বাংলাদেশ থেকে ইসলামী মূল্যবোধকে সমূলে উৎখাতের কাজে নেমে পড়েছে। সেই সাথে সীমান্ত পারের প্রভুদের নির্দেশে নীলনকশা মোতাবেক সাংস্কৃতিক ফ্রন্টে মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি ভারতের একটি বিশাল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কৃষ্টি, রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানকে মহিমান্বিত করার সূক্ষ্ম কিন্তু জোরদার প্রচারণা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই দেশের প্রথম সরকার

www.pathagar.com

তথাতথিত অসাম্প্রদায়িকতার নামে সমস্ত মুসলিম ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও রীতিনীতি ধ্বংস করার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের পর ইসলামী আদর্শ বিনষ্টের এই অভিযান প্রতিহত করা হয়। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মধ্য দিয়ে যে প্রক্রিয়া শুরু হয় ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করার মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়া একটি সুস্পষ্ট রূপলাভ করে। মাঝখানে ২১ বছর অতিবাহিত হয়। কুখ্যাত দাউদ হায়দারের পর তসলিমা নাসরিন, কবীর চৌধুরী বা শামছুর রাহমানের মতো দু'চারজন তল্লিবাহক কবি-সাহিত্যিক ছাড়া সমষ্টিগতভাবে পবিত্র ইসলামের বিরুদ্ধে সংগঠিত আক্রমণের দুঃসাহস কেউ দেখাতে পারেনি। কিন্তু ১৯৯৬ সালে ক্ষমতার হাতবদল এবং রাজনৈতিক দৃশ্যপট পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামের আদর্শ, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য ও আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে শুরু হয় প্রকাশ্য ও সূক্ষ্ম আক্রমণ। ইসলামী মূল্যবোধ বিপন্ন করার এই চক্রান্তে কতিপয় চিহ্নিত পরগাছাকে মাঠে নামিয়ে দিলেও পুতুল নাচের নেপথ্য সূত্রধরে ভূমিকায় রয়েছে ক্ষমতাসীন দল। তাদের সক্রিয় সহযোগিতা দিচ্ছে সেই সব রাজনৈতিক পরান্নভোজির দল যাদের সাথে মাটির কোন সম্পর্ক নেই। তাই এরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ বিপক্ষের সর্বনাশা ও অপরিণামদর্শী ধূয়া তুলে শাসক দলের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। সেই নিরাপদ স্কন্ধে চেপে বসে এসব পরজীবী ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং মূল্যবোধের বিরুদ্ধে গদা ঘোরাচ্ছেন। চট্টগ্রাম হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশব্যাপী জামায়াত ইসলামী এবং ছাত্র শিবিরের বিরুদ্ধে যে পাইকারী ধরপাকড় শুরু হয়েছে সেটাও ঐ ভারতের রফতানী করা নীলনকশারই একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। জামায়াত-শিবির ধরার নামে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে। সেই দলীয় ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের সূত্র ধরে ফেনী সহ বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে দাঁড়ি এবং টুপি পরিহিত দেখলেই জামায়াত-শিবির জিগির তুলে গ্রেফতার করা হচ্ছে। এ দিকে হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদকে মাঠে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। তারা প্রকাশ্যে সম্মেলন করে এমন তিনটি দাবি উত্থাপন করেছে যেগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং ভৌগলিক অখণ্ডতা, সংবিধান এবং হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিরুদ্ধে একটি প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশের ২ কোটি হিন্দুর জন্য (সংখ্যাটি অবশ্য ওদের দেয়া) বাংলাদেশেরই একটি অঞ্চল নিয়ে একটি স্বাধীন স্বতন্ত্র হিন্দুরাষ্ট্র গঠন, পবিত্র সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলামের অনুচ্ছেদটি বাতিল এবং অর্পিত সম্পত্তি (শত্রু সম্পতি) আইন বাতিল করে সাড়ে ৬ লাখ একরের বেশি ভূমি এবং ঘরবাড়ি হিন্দুদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া এই সব দাবির অন্তর্গত। ইতোপূর্বে এই হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদই বালাদেশের যুক্ত নির্বাচন প্রথা বাতিল করে জনসংখ্যার ভিত্তিতে হিন্দুদের জন্য পৃথক আসন সংরক্ষণ সম্বলিত পৃথক নির্বাচনের দাবি তুলে ছিল।

বাংলাদেশের অসাম্প্রদায়িক মুসলিম জনগোষ্ঠী গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছেন যে শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগ তার প্রতিষ্ঠিত হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নীতি এবং আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। মুসলিম লীগ আমলেও সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশে) পৃথক নির্বাচন প্রথা চালু ছিল। জনাব সোহরাওয়ার্দী সেই প্রথা বাতিল করে যুক্ত নির্বাচন

www.pathagar.com

ব্যবস্থা চালু করায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সোহরাওয়ার্দীর প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, পৃথক নির্বাচনে হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিভেদ উৎকণ্ঠারূপে প্রতিভাত ছিল। আজ হাসিনার আমলে সেই সাম্প্রায়িকতার পুনরুজ্জীবনের জন্য পৃথক নির্বাচনের আওয়াজ ওঠলে তার সরকার রহস্যময় নীরবতা পালন করেন। অপির্ত সম্পত্তি আইন বাতিল করে লাখ লাখ একর জমিজমা এবং ঘরবাড়ী হিন্দুদের ফেরত দেবার দাবি যদি যুক্তিসঙ্গত হত তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবের আমলেই সেই সম্পত্তি ফেরত দেওয়া হত। কোন দলের কর্মীরা কি পরিমাণ শত্রু সম্পত্তি ভোগ করছেন, প্রধানমন্ত্রীর উচিত আগে সেই হিসাব নেয়া। যদি তিনি সঠিক হিসাব নেন তাহলে যে চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে আসবে সেটা দেখে তার মাথা ঘুরে যাবে। আর সেই সম্পত্তি হাতছাড়া হলে তার নিজের দলকেই সামাল দেয়া কঠিন হবে। শত্রু সম্পত্তি ফেরত দিলে শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতবিরোধ নয়, বাংলাদেশের শহর বন্দর থেকে শুরু করে গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত সামাজিক সংঘাত ও সংঘর্ষ শুরু হবে।

এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর পবিত্র ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আঘাত করা হয় মাদ্রাসা শিক্ষা বাতিলের অপচেষ্টার মাধ্যমে। স্বাধীনতার পর বালাদেশের অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ চেয়ারে বসেই মাদ্রাসায় সরকারী অনুদান বন্ধের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তখন প্রিন্সিপাল আবুল ফজল দৈনিক ইত্তেফাকে লিখেছিলেন, তাজউদ্দীন আমার নামাজে জানাজা কি তুমি পড়াবে?

এটা ব্যাখ্যা করে বলার অবকাশ রাখে না যে, মাদ্রাসা শিক্ষা যদি বাতিল হত, যদি মক্তব মাদ্রাসাগুলো উঠে যেত তাহলে শুধুমাত্র যে হাজার হাজার ইসলামী শিক্ষক বেকার হতেন তাই নয়, বরং লাখ লাখ সাধারণ মানুষ ইসলামের প্রাথমিক ধারণা এবং ইসলামের আলো থেকে বঞ্চিত হতেন। তবে তাদের এ অপচেষ্টা ফলবর্তী হয়নি। লাখ লাখ মুসল্লী এবং হাজার হাজার সাধারণ মানুষ সেই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ফলে মাদ্রাসা শিক্ষা বাতিলের চক্রান্ত বানচাল হয়ে যায়। ইসলামী আদর্শ এবং মূল্যবোধের বিরুদ্ধে শাসক দলে হামলা এবারই প্রথম নয়। বাংলাদেশের প্রথম সরকারের আমল থেকে এর শুরু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে পবিত্র কালামে পাক 'রাব্বি জিদনী এলমা' বাদ দেয়া হল। শতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী ঢাকার ইসলামিক ইন্টারমেডিয়েট কলেজের নাম বদলে ফেলা হল কারণ ঐ নামের প্রথমে রয়েছে 'ইসলামিক' শব্দটি। নতুন নামটি হল কবি নজরুল কলেজ। এখানেও কবির নামটি পুরা দেওয়া হল না। কারণ নজরুল ইসলাম বললে তো 'ইসলাম' এসে যায়। সুতরাং কবি নজরুল ইসলাম কলেজ নয়, কবি নজরুল কলেজ। জাহাঙ্গীর নগর মুসলিম ইউনিভার্সিটির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে শুধু জাহাঙ্গীর নগর ইউনিভার্সিটি, ফজলুল হক মুসলীম হল থেকে 'মুসলিম' বাদ দিয়ে শুধু ফজলুল হক হল করা হল। যে ঐতিহাসিক সলিমুল্লাহ মুসলিম হল কয়েক যুগ ধরে শুধু মুসলিম হল নামে ঢাকার লোকজনের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে সেই মুসলিম হলের 'মুসলিম' শব্দের খাৎনা করে সলিমুল্লাহ হল রাখা হল। পক্ষান্তরে রামকৃষ্ণ মিশন রোড, জয়কালী মন্দির রোড, হলি

www.pathagar.com

ফ্যামিলি স্কুল, সেন্ট গ্রেগরী স্কুল প্রভৃতি নামের ওপর কোন আঁচর পড়ল না। ১৯৭২-এর সরকারের আমলে ধর্ম নিরপেক্ষতার অর্থ হল হিন্দু বৌদ্ধ ও খ্রীস্টান ধর্মীয় ঐতিহ্যকে অক্ষত রেখে বেছে বেছে ইসলাম ও মুসলমানী নাম ও ঐতিহ্যের উপর খঞ্জর চালানো। তবে কালের প্রবাহের সাথে সাথে রাজনৈতিক কৌশলও বদলে যায়। সুতরাং ১৯৭২ থেকে ৭৫ সাল পর্যন্ত যে কৌশল অবলম্বন করে ইসলামী আদর্শ ও মূল্যবোধ ধ্বংসের অপচেষ্টা করা হয়েছিল, ৩০ বছর পর সেই কৌশল পরিবর্তন করা হয়েছে। তাই এবার বাংলাদেশে আনা হচ্ছে 'আনন্দ পাবলিশার্সকে। ওরা কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে বাংলাদেশের প্রকাশনা শিল্পকে গিলে খাবে। বড় বড় মাছ ছোট ছোট মাছকে খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করে।

শোনা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে তারা নাকি ১০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পরিকল্পনা করেছে। এভাবে বাংলা দেশের প্রকাশনা জগতে ছোট ছোট মাছকে গিলে খাওয়ার পর বড় মাছরূপী 'আনন্দ' যখন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করবে, তখন দেখা যাবে এক ভয়াল সাম্প্রদায়িক চেহারা। মানুষ বিস্ফোরিত নেত্রে দেখবে এমন এক সাহিত্য যার মাধ্যমে প্রতিফলিত হবে দশভুজার অবয়ব। মুসলিম কৃষ্টি এবং সংস্কৃতির রাহুগ্রাস রূপেই ধেয়ে আসছে 'আনন্দ' পাবলিশার্স।

জামায়াত শিবিরের বিরুদ্ধে আওয়ামী ঘরানার রণদামামা সারাদেশে এক শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা সৃষ্টির ভয়াল চক্রান্ত। এই চক্রান্তের সাথে জড়িয়ে আছে বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র, জড়িয়ে আছে বঙ্কিম চন্দ্রের 'বন্দে মাতরম' এর দূরাগত আওয়াজ।

দৈনিক ইনকিলাব ২৩/৭/২০০০

ওপারে সাজঘর এপারে মঞ্চ জাতিকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করার আত্মঘাতী ষড়যন্ত্র আবার স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষ শক্তির জিগির

মোবায়েদুর রহমান ॥ গত মাসে অর্থাৎ জুলাই মাসে বাংলাদেশে তিনটি ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। সাধারণভাবে এগুলো খুব বড় মাত্রার অপরাধমূলক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারতো। কিন্তু ঘটনাসমূহ ঘটার সাথে সাথে, এবং পরবর্তীতে এসব ঘটনার সুস্পষ্ট রাজনৈতিক রঙ চড়ানো হয়েছে। শুধু তাই নয়, শাসক গোষ্ঠী এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে রাজনৈতিক জিগির তুলেছে প্রভুত্বকামী ভারতেও তাৎক্ষণিকভাবে তার প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। এই তিনটি লোমহর্ষক ঘটনার পর সরকারের জুলুমের স্টীম রোলার যেদিকে চালানো হয়েছে এবং যে উগ্র জঙ্গীবাদ (জিম্বোইজম) তোলা হয়েছে তার পরে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কৌশল পরিষ্কার হয়ে গেছে। সমাজের অগ্রসর অংশ স্পষ্ট উপলব্দি করেছেন যে, অদৃশ্য শক্তির অঙ্গুলি হেলনে তাদের স্থানীয় এজেন্টরা রাজনৈতিক রঙ্গালয়ে পুতুল নাচের আসর বসিয়েছেন। রাজনীতির মঞ্চে ভয়াবহ সহিংসতা আমদানী এবং উত্তেজক ও উস্কানিমূলক জিঘাংসাবৃত্তির আওয়াজ তুলে রাজনীতির কুশীলবরা এই দুর্ভাগ্য জাতির মাঝে হিংসাত্মক বিভাজনের চিরস্থায়ী রেখা টেনে দিচ্ছেন। বহদ্দারহাটের পৈশাচিক অষ্ট খুন কে করেছে সেটা বিচার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জানা যাবে। তবে যারাই করে থাকুক না কেন এই ভয়াল ঘটনার সাথে স্বাধীনতার পক্ষ বা বিপক্ষ শক্তির অস্তিত্ব কোনভাবেই নেই। আজ পরিষ্কার করে

www.pathagar.com

একটি কথা বলার সময় এসেছে যে, যে ইসলামী ছাত্র শিবিরকে এই অপরাধের সাথে জড়িত করা হচ্ছে তারা সেই অপরাধ সংঘটিত করেছে কিনা সেটা বিচার সাপেক্ষ। কিন্তু তাদের উপর যে অপবাদই আরোপ করা হোক না কেন তারা আর যাই হোক, স্বাধীনতা বিরোধী নন। কারণ শিবিরের যারা নেতা-কর্মী বা সমর্থক তারা সকলেই ছাত্র। তাদের বয়স সর্বোচ্চ ২৫/২৬ বছর। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে ২৯ বছর আগে। অর্থাৎ বাংলাদেশের জন্মের পর শিবিরের নেতা বা সমর্থকের জন্ম। এরা কিভাবে স্বাধীনতা বিরোধী হয়? উঠতে বসতে যারা তোতা পাখীর মত স্বাধীনতা বিরোধিতার বুলি কপচাচ্ছেন তারা বলুন, এই পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখার আগেই কি শিবিরের ছেলেরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হয়ে বসেছিল? রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য আওয়ামী ঘরানা একটি প্রজন্মের একটি উল্লেখযোগ্য অংশকে স্বাধীনতা বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে দেশের জন্য বিপদ ডেকে আনলেন।

এ জাতির চরম দুর্ভাগ্য হলো এই যে, স্বাধীনতার ৩০ বছর পর স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী জামায়াতে ইসলামীকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলে অষ্টপ্রহর গালিগালাজ করছেন। জামায়াতে ইসলামী যদি স্বাধীনতাবিরোধী হয় তাহলে জাতীয় সংসদে তাদের প্রতিনিধিত্ব রয়েছে কীভাবে? এর আগের সংসদেও তাদের ২০ জন এমপি ছিলেন কীভাবে? তারা যদি স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তিই হবেন তাহলে তাদেরকে সংগঠন করা, জনমত গঠন করা এবং ইলেকশন করার অধিকার দেওয়া হয় কীভাবে? অন্যেরা যে যাই বলুক না কেন, কোন দলকে স্বাধীনতাবিরোধী বলা কি কোন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শোভা পায়? যারা স্বাধীনতাবিরোধী তারা তো দেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করতে চায়। প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় কর্তব্য হলো, সেই স্বাধীনতাকে জোরদার করা। তাহলে পার্লামেন্টারী পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি কীভাবে এমন রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন? তাহলে তিনি কি নেহায়েৎ বৈরী প্রচারণা দিয়ে রাজনৈতিক শত্রুকে কুপোকাত করতে চাচ্ছেন? শাসক দলের জানা উচিত যে, দেশের স্বাধীনতাকে কখনো রাজনৈতিক পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যদি সত্যিই মনে করেন যে, জামায়াত-শিবির স্বাধীনতাবিরোধী তাহলে তাদের বিরুদ্ধে তিনি আইনগত ব্যবস্থা নিচ্ছেন না কেন? কিন্তু তিনি কীভাবে সেই ব্যবস্থা নেবেন? জনাব এরশাদ যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তার বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে বিএনপি, আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতে ইসলামী সহযাত্রী ছিল। আবার বেগম জিয়া যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তখন তার বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলনে আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী এবং জাতীয় পার্টি সহযাত্রী ছিল। মাওলানা নিজামীকে পাশে বসিয়ে শেখ হাসিনা সভাও করেছেন। '৯১ সালে প্রেসিডেন্ট পদে জামায়াতে ইসলামীর দলীয় এমপিদের সমর্থন লাভের জন্য শেখ হাসিনা তার দলীয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মরহুম বদরুল হায়দার চৌধুরীকে জামায়াত নেতা গোলাম আজমে কাছে পাঠিয়েছিলেন। এরশাদের ৯ বছর এবং খালেদা জিয়ার ৫ বছর, এই ১৪ বছর জামায়াতের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আওয়ামী লীগ কাজ করল। সেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার সাথে সাথেই জামায়াত রাতারাতি দেশদ্রোহী হয়ে যায় কীভাবে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নাসিম যত বড় বড় কথা বলুন না কেন, জামায়াত-

www.pathagar.com

শিবিরকে নিষিদ্ধ করা আইনগতভাবে চাট্টিখানি কথা নয়। হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে এমন একটি হঠকারী প্রস্তাব জাতীয় সংসদে তারা পাস করাতে পারবেন। কিন্তু সাথে সাথে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে, সংসদে সে সব প্রস্তাবই আইনের বৈধতা পাবে যেসব প্রস্তাব সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। আর সে কারণেই প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আওয়ামী লীগের মন্ত্রী-শাস্ত্রিরা দল নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে হাওয়াই হামলা চালাচ্ছেন। ক্ষমতায় যাওয়ার পর যিনি অতীতে থাকেন ডেমাগগ বা মেঠো বক্তা-ক্ষমতায় যাওয়ার পর তিনি হয়ে উঠেন 'স্টেটস্‌ম্যান'। কিন্তু দুঃখজনক হলো এই যে, বর্তমান ক্ষেত্রে ডেমাগগ থেকে স্টেটসম্যানে রূপান্তরের ঘটনা ঘটেনি। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর উভয় দেশে নতুন শাসকরাই, অর্থাৎ পন্ডিত নেহরু এবং জনাব জিন্নাহ 'স্টেটসম্যানসূলভ' প্রাজ্ঞতার পরিচয় দেন। এমনকি শেখ হাসিনার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানও দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে স্টেটসম্যানসূলভ দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ভারত বিভক্ত হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ যথাক্রমে পাকিস্তানে দাবীর বিরোধিতা এবং ভারত বিভক্তির দাবীতে অটল থাকে। ভারত বিভক্তির পর মুসলিম লীগের অনেক নেতা-কর্মী ও সমর্থক, যারা ভারত ভেঙ্গে পাকিস্তান চেয়েছিলেন, তারা ভারতেই থেকে যান। এ জন্য ভারতের নতুন সরকার অর্থাৎ পন্ডিত হেরুর কংগ্রেস সরকার মুসলিম লীগ করার অপরাধে কাউকে শাস্তি দেয়নি বা কারও বিরুদ্ধে কোন বৈষম্যমূলক আচরণও করেনি। অনুরুপভাবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এক ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। ঐ ভাষণে তিনি বলেন, আজ থেকে পাকিস্তানে আর কেউ হিন্দু নয়, কেউ মুসলমান নয়। আজ থেকে সকলেই আমরা পাকিস্তানী। আসুন আমরা সকলে মিলে একটি ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান গড়ে তুলি। শুধুমাত্র এই ঐক্যবদ্ধ ভাষণ দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি তিনি। বসন্তকুমার দাসসহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী করেছিলেন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের জন্য চাকরি-বাকরি এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধাদানের ব্যবস্থাও করেছিলেন। কংগ্রেস করার জন্য এবং পাকিস্তান দাবীর বিরোধীতা করার জন্য একজন কংগ্রেস কর্মীকেও হয়রানি করা হয়নি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর দালাল আইন তৈরী করা হয়েছিল। এই আইনের অধীনে লক্ষাধিক লোককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তারপর তাদের বিচারও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ৩ বছর ধরে এই দালাল ধরা এবং দালাল মারার কাজ করতে করতে শেখ মুজিবও বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই প্রক্রিয়ায় একটি জাতিকে শুধু বিভক্তই করা হচ্ছে। এই উপলব্ধি থেকেই তিনি ১৯৭৪ সালে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। জাতিকে স্থায়ীভাবে বিভক্ত করে রাখার বিষময় পরিণতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তাই একজন মুক্তযোদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর দলাল আইন বাতিল করেন এবং ডানপন্থী, বামপন্থী এবং মধ্যপন্থীসহ সর্বশ্রেণীর পলিটিশিয়ানদের মাঝে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য গড়ার জন্য জাগো দল থেকে অবশেষে বিএনপি গঠন করেন। পরবর্তী ২১ বছর ছিল জাতীয় ঐক্য ও সংহতির স্বর্ণযুগ।

www.pathagar.com

কিন্তু ক্ষমতাগ্রহণের পর শেখ হাসিনা তার পিতার ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন প্রয়াস থেকে দূরে সরে আসেন এবং ঘাদানিকপন্থী জনবিচ্ছিন্ন কতিপয় স্বঘোষিত আঁতেলের হাতে বন্দী হন। রাজনীতি নিরপেক্ষ সচেতন জনগোষ্ঠী অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছেন যে, বিগত ৪ বছর ধরে শেখ হাসিনা জাতিকে ক্রমাগত বিভক্ত করেই চলেছেন। শেখ মুজিবের কন্যা হিসেবে ঐক্যবদ্ধ করার যে বিরল সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন সেই সুযোগ পদদলিত করে তিনি বাংলাদেশী জাতির মাঝে বিভাজন রেখাকে চিরস্থায়ী করতে চলেছেন।

আজ যখন ভারতের স্টেটসমান পত্রিকাও চট্টগ্রামের অষ্ট খুন, যশোরের সাংবাদিক খুন এবং কোটালীপাড়ার বোমা পুঁতে রাখার ঘটনায় ইসলামী মৌলবাদীদের ষড়যন্ত্রের গন্ধ পায় এবং ইসলামপন্থী রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করার ধ্বনির প্রতিধ্বনি তোলে তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, কোথা থেকে কি ঘটেছে! কোন সুতোর টানে কে কোথায় নাচছে। ওপারে রয়েছে সাজঘর আর এপারে মঞ্চ। সেগুলো এখন দিনের আলোর মত পরিষ্কার। যতই দিন যাচ্ছে ততই সেই সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত উন্মোচিত হচ্ছে। আর জনগণ রাজনীতির আকাশে দেখতে পাচ্ছেন দুর্যোগের ঘনঘটা।

দৈনিক ইনকিলাব ২/৮/২০০০

একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার পাঁয়তারা!

এলাহী নেওয়াজ খান ॥ বাংলাদেশে সাংবিধানিক ও আইনের শাসনের অপমৃত্যু ঘটিয়ে আবারো কি একদলীয় শাসনের যাঁতাকলে দেশটিকে নিষ্পেষিত করার পাঁয়তারা চলছে। গত রবিবার রাজধানীর সর্বত্রই সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে এই প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে বারবার। যেখানে সাংবিধানিক সরকার বিরাজ করছে, সেখানে ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে দেশের বিরোধী দলীয় নেত্রী তথা নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার বিষয়টি সচেতন মহলকে দারুণভাবে উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত করে তুলেছে।

গত শনিবার নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের এক সভায় বিরোধী দলীয় নেত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এইচ এম এরশাদ এমপিকে নারাযণগঞ্জে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। গত রবিবার প্রকাশিত সরকারের কট্টর সমর্থক দৈনিক 'ভোরের কাগজ'-এর রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, 'বিরোধী দলীয় নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে নারায়ণগঞ্জে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। গত শনিবার বিকালে এক সমাবেশে এই ঘোষণা দেওয়া হয়। স্থানীয় এমপি জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক এ কে এম শামীম ওসমান গোপালগঞ্জে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হত্যা প্রচেষ্টার সঙ্গে খালেদা জিয়া জড়িত আছেন বলে উল্লেখ করেন এবং নারায়ণগঞ্জে খালেদা জিয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, যদি খালেদা জিয়া নারায়ণগঞ্জে প্রবেশ করতে চায় তবে তা অবশ্যই প্রতিহত করা হবে।" উল্লেখ্য, ইংরেজি দৈনিক 'ইনডিপেন্ডেন্টে' অবাঞ্ছিত ঘোষণার তালিকায় লেঃ জেনারেল (অবঃ) এরশাদের নামও উল্লেখ করা হযেছে। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ক্ষমতাসীনরা জামায়তসহ প্রধান

www.pathagar.com

তিনটি বিরোধী দলের শীর্ষ নেতাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করলো। অর্থাৎ নারায়ণগঞ্জে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক তৎপরতাকে নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। অনেকে ধারণা করছেন যে, একটি সুগভীর পরিকল্পনার অংশ হিসেবে নারায়ণগঞ্জে এই ঘোষণা দেয়া হয়েছে এবং এর পর বিভিন্ন জেলা থেকে ঐ ঘোষণা আসতে পারে।

কিন্তু পর্যবেক্ষকরা বলছেন সম্ভবত সরকার গণতন্ত্র ও সাংবিধানিক সরকার ব্যবস্থায় কিভাবে একদলীয় শাসন কায়েম করা যায় তারই একটা প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এ ধরনের প্রক্রিয়ায় অতীতে বিশ্বের বহু দেশে ফ্যাসিবাদের উত্থানের দৃষ্টান্ত রয়েছে। আর তৃতীয় বিশ্বের কোন সরকার আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সর্বাত্মক সমর্থণ পেলে বিরোধী দলকে রাষ্ট্রীয় শক্তির জোরে দমন করে সহজেই একদলীয় শাসন কায়েম করতে পারে।

তবে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ও বিবেকবান মানুষের প্রশ্ন হচ্ছে যে, সরকারের পক্ষে রাষ্ট্রীয় শক্তির জোরে বিরোধী দলসমূহকে ধ্বংস করে একক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হতে পারে। কিন্তু এতে করে কি সরকারের কোন নৈতিক বিজয় ঘটবে? পর্যবেক্ষকরা বলছেন, এতে মূলত সরকারের নৈতিক পরাজয় ঘটবে। বিশেষ করে সংবিধান ও আইনের শাসনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলী প্রদর্শন করার পরিণতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কখনো শুভফল বয়ে আনে না।

এদিকে আমাদের সংবিধানে বাক-স্বাধীনতা ও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ নিশ্চিত করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের যে কোন স্থানে যাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। যেমন সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "জনশৃঙ্খলা বা জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসঙ্গত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে ও নিরস্ত্র অবস্থায় সমবেত হইবার এবং জনসভা ও শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে।" তাই সংবিধানের অনুচ্ছেদ অনুসারে বেগম খালেদা জিয়া, এইচ এম এরশাদ কিম্বা অধ্যাপক গোলাম আযম নারায়ণগঞ্জে কোন সমাবেশে যোগদান করতে গেলে ক্ষমতাসীনরা কোন আইন বলে তা বাধা দেবেন? কেবলমাত্র কি পুলিশী শক্তির জোরে সংবিধানকে লংঘন করা যায়?

এছাড়া সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদের (১) ধারায় বলা হয়েছে, "সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হইবে।" কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমান সরকার রাষ্ট্র শক্তির জোরে যেভাবে বিরোধী দলকে দমন করছে, তাতে কি সংবিধানের ঐ ধারা সুস্পষ্টভাবে লংঘিত হচ্ছে না? বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দকে জনসভা করতে বাধা দেয়া, ভেঙ্গে দেয়া ও চলাচলে বাধা প্রদানের পাশাপাশি ক্ষমতাসীন দলকে পুলিশ পাহারায় সভা, মিছিল সশস্ত্র হামলা চালনার অবাধ সুযোগ দেওয়া কি সংবিধান লংঘন করা নয়? এসব প্রশ্নের জবাব ক্ষমতাসীনরা জনগণকে কিভাবে দেবেন সেটাও এক বিরাট প্রশ্ন।

তবে পর্যবেক্ষকদের অভিমত হচ্ছে যে, সংবিধানকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে এক দলীয় কর্তৃত্বপরায়ণ শাসন কখনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না।

দৈনিক ইনকিলাব ২৫/৭/২০০০

www.pathagar.com

ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার আরও এক নীলনকশা

এলাহী নেওয়াজ ॥ সম্প্রতি সংঘটিত কিছু ঘটনাবলী এবং ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দ ও তাদের অনুসারী বুদ্দিজীবীদের বক্তৃতা-বিবৃতি দেশবাসীকে ভয়ানকভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। বিশেষ করে, গত বুধবার বাংলাদেশের সংবিধান প্রণেতা ডঃ কামাল হোসেনসহ চারজন আইনজীবীর বাসসকে দেয়া বক্তব্যে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য '৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার পরামর্শে দেশের সচেতন মহলে প্রচন্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। ডঃ কামাল হোসেন, বাংলাদেশ বার কাউন্সেলের ভাইস চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম, এ্যাডভোকেট গাজিউল হক ও ব্যারিস্টার শফিক আহমদের সরকারী বার্তা সংস্থা বাসসকে পৃথক পৃথকভাবে দেয়া বক্তব্যে একই সুরের প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা গেছে। তারা জামায়াত-শিবিরসহ সাম্প্রদায়িক ও ফ্যাসিস্ট শক্তির রাজনীতি কার্যকরভাবে নিষিদ্ধ করার জন্য ১৯৭২ সালের সংবিধানের সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদটি পুনরুজ্জীবিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তারা অনুচ্ছেদটি পুনরুজ্জীবিত না হওয়া পর্যন্ত এ ইস্যুতে একটি জাতীয় ঐকমত্যে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার জোর প্রচেষ্টা চালানোরও পরামর্শ দিয়েছেন। গতকাল (বৃহস্পতিবার) বিভিন্ন দৈনিকে ঐ চার আইনজীবীর এই বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ার পর পর্যবেক্ষকদের মধ্যে এই ধারণা জন্মেছে যে, হয়তো ক্ষতাসীনরা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার লক্ষ্যে '৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাপক প্রচারণা শুরু করেছে। এই প্রচারণার লক্ষ্য হচ্ছে একটা গ্রাউন্ড তৈরি করা। আর সে জন্য সরকার হয়তো একটা ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে খুব পরিকল্পিতভাবে বিভিন্ন ধরনের ভয়ংকর সব ঘটনাবলী ঘটানো হচ্ছে। আর এসব ঘটনার পরপরই অভিযুক্ত করা হচ্ছে জামায়াত-শিবিরসহ বিভিন্ন ইসলামী শক্তিকে। ক্ষমতাসীনদের ভাবখানা এমন যে, ইসলামী শক্তি খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এই শক্তিকে নিষিদ্ধ না করলে ক্ষমতাসীন ও তাদের মিত্রদের নীলনকশা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। আর সরকারের এ ধরনের কোন পরিকল্পনা না থাকলে সরকারী বার্তা সংস্থা বাসসের মাধ্যমে ঐ ধরনের প্রচারণা চালানো হতো না বলেও পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন।

কিন্তু পর্যবেক্ষকরা প্রশ্ন করছেন যে, সরকার যদি '৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যান অথাৎ ইসলামী রাজনীতিকে নিষিদ্ধ করার অনুচ্ছেদটি সংযোজন করতে চান তাহলে সেটা কিভাবে করবেন? কারণ সংবিধান সংশোধন ও সংযোজন করতে হলে পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন। ক্ষমতাসীন দলের সে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই। তাহলে কি সরকার আগামী নির্বাচনে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে নিশ্চিত হয়েই আগেভাবে একটা গ্রাউন্ড তৈরীর জন্য এ প্রচারণা চালাচ্ছেন?

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৬ মার্চ বিবিসির সাথে দেয়া সাক্ষাৎকারে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাবে তার দৃষ্টিভঙ্গি বলে দেয়ার পর থেকেই সরকারের বিভিন্ন মহল থেকে একই সুরে প্রচারণা শুরু করা হয়েছে।

www.pathagar.com

প্রধানমন্ত্রী ঐ সাক্ষাৎকারে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এ ধরনের ডিমান্ড দেখতে পাচ্ছি। এটা নির্ভর করে জনগণের দাবীর উপর।' প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই দেখা যাচ্ছে যে, বাসসসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ ও অনুসারী সংগঠন থেকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী জোরালো ভাবে করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় গত ২৮ জুলাই রমনা বটমূলে অনুষ্ঠিত 'সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের' মহাসম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে এক প্রস্তাবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনালে জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযমসহ একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন করার দাবী বাস্তবায়নের জন্য জনমত গঠনের লক্ষ্যে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে কর্মসূচী পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের এই দাবীর পরই গত বুধবার সরকারী বার্তা সংস্থা বাসসকে চার আইনজীবী যেমন বলেছেন যে, 'জামায়াত-শিবিরকে নিষিদ্ধ করার জন্য গণভোটের আয়োজন করা যায়।' তাহলে কি সরকার সংবিধানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার অনুচ্ছেদ সংযোজন করার আগেই ঐ তথাকথিত জনগণের দাবীর কথা উল্লেখ করে কি একটা গণভোট করারও পরিকল্পনা করছেন? যে চার আইনজীবী ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য '৭২ সালের সংবিধানে ফিরে যাওয়া এবং গণভোটের কথা বলেছেন, তারা সবাই রাজনৈতিকভাবে সরকারী দলের সাথে একনিষ্ঠভাবে ঘনিষ্ঠ। এদের মধ্যে ডঃ কামাল হোসেনের সাথে বিভিন্ন কারণে কিছুটা দূরত্ব সৃষ্টি হলেও এই ইস্যুতে হয়তো তারা এখন এক সুতোয় আবদ্ধ হয়েছেন বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন। আর এ কারণেই এখন এই ধারণা করা যায় যে, ক্ষতাসীনরা সত্যি ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার জন্য বিকল্প অনেকগুলো চিন্তা-ভাবনা করছেন। তার মধ্যে গণভোট অন্যতম। আর সেই গণভোটের দাবীটা ক্ষমতাসীনরা তাদের ঘরানার চারজন আইনজীবীকে দিয়ে করালেন।

সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে যে, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে সরকার খুবই সিরিয়াস। পর্যক্ষেকরা বলেছেন, এক্ষেত্রে সরকারের সবচেয়ে বড় লাভ হবে সকল বামপন্থীদের নিয়ে একটি মেরুকরণ সৃষ্টি করা। বিশেষ করে এই ইস্যুকে কেন্দ্র করে তারা অভিমানী ১১ দলীয় বাম জোটকে কাছে পাবেন।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই নানা ইস্যুতে কখনও তালেবান ইস্যু তৈরি করে ইসলামী দলগুলোর নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করেছে। সর্বশেষ চট্টগ্রামের ৮ খুন এবং কোটালীপাড়ায় প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের অপচেষ্টায় বোমা পুঁতে রাখার ঘটনার পর এখন সারাদেশে আলেম-ওলামা, মসজিদের ইমামদের ওপর নির্যাতন শুরু করেছে। একই সঙ্গে ক্ষমতাসীন দল সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধা ফ্রন্ট গঠন করে বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মেলন করে এবং হিন্দু-বৌদ্ধ ঐক্যপরিষদ দাবী তোলে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ইসলাম বাতিল করে '৭২ সালের সংবিধান পুনরুজ্জীবিত করার। এসব থেকে বোঝা যায় যে, সরকার একটি সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা হাতে নিয়ে গোড়া থেকেই ইসলামী শক্তিকে নিষিদ্ধ করার প্রচারণা শুরু করে এবং এখন সেটা কার্যকর করার দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে।

দৈনিক ইনকিলাব ৪/৮/২০০০

www.pathagar.com

পূজা কমিটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনের ঘোষণা

শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল ও 'বিসমিল্লাহ' বাদ না দিলে হিন্দুরা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবি জানাবে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ গতকাল ঢাকেশ্বরী মন্দিরে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে হিন্দু সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে অর্পিত (শত্রু) ও অনাগরিক সম্পত্তি আইন বাতিল এবং সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' তুলে দেয়া না হলে অখন্ড বাংলাদেশ ভেঙ্গে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের হুমকি দিয়েছেন। তারা প্রয়োজন হলে বর্তমান আওয়ামী সরকারের পতন ঘটানোরও হুমকি দেন। বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে ১৯৭২ সালের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান পুনঃ বহালের আহ্বান জানিয়ে পূজা কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেন, অর্পিত সম্পত্তি আইনের কারণে বর্তমানে ৫০ লাখ হিন্দু বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে অবস্থান করছে। দীর্ঘদিনেও ভারতের নাগরিকত্ব পায়নি। অপরদিকে এদেশে বসবাসকারী ১ কোটিরও বেশি হিন্দু ঐ আইনের যাঁতাকলে নির্যাতিত নিষ্পেষিত হচ্ছে। এ অবস্থায় দু'পারের এই হিন্দুরা মিলে যদি বাংলাদেশের একটি অঞ্চল নিয়ে পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র দাবী করে বসে তাহলে বাংলাদেশ খণ্ড-বিখন্ড হয়ে যাবে। তবে এর জন্য তাদের দোষ দেয়া যাবে না। নেতৃবৃন্দ সংবিধানের ৫ম সংশোধনী (বিসমিল্লাহ) ও ৮ম সংশোধনীকে (রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম) অবৈধ আখ্যা দিয়ে বলেন, "বর্তমান সরকার মাত্র ৫ লাখ উপজাতীয় চাকমার স্বার্থে কুখ্যাত অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন এখনো বাতিল করেনি। কিন্তু তাদের জানা উচিত– আমাদেরও ভোট আছে, সামনে 'গণেশ' উল্টে যাবে। এই সরকার ৫ লাখ চাকমাকে যখন ঠেকাতে পারেনি তখন আমাদেরও ঠেকাতে পারবে না।" তারা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নির্মীয়মাণ স্বাধীনতা স্তম্ভের স্থানে অবিলম্বে রমনা কালী মন্দির স্থাপন এবং অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিলের সাথে সাথে ভারত থেকে ৫০ লাখ বাঙালি হিন্দুকে ফিরিয়ে আনারও দাবী জানান। আসন্ন দুর্গাপূজার আগে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করা না হলে এবার সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে বলেও তারা সরকারকে হুঁশিয়ার করে দেন।

ঢাকেশ্বরী মন্দির মেলাঙ্গনে গতকাল (শুক্রবার) দুপুরে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সভাপতি বিধুভূষণ সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির এই দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি মেজর জেনারেল সিআর দত্ত (অবঃ) এবং সম্মেলনের উদ্বোধক ও বিশেষ অতিথি হিসেবে সুপ্রীম কোর্টের সাবেক বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়া অন্যান্যের মধ্যে আরও বক্তৃতা করেন, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক, বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কাজল দেবনাথ, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক দ্বীপেন চ্যাটার্জী, এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী, এডভোকেট সত্যেন্দ চন্দ্র ভক্ত প্রমুখ। সম্মেলনে গৃহীত শোক প্রস্তাবে ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারীর মৃত্যুতে

www.pathagar.com

কোন শোক প্রস্তাব গ্রহণ না করায় কয়েকজন হিন্দু সাধু প্রতিবাদস্বরূপ সম্মেলন স্থান ত্যাগ করেন।

দিনব্যাপী এই সম্মেলন ও বার্ষিক সাধারণ সভা শেষে অধ্যাপক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিককে সভাপতি এবং আওয়ামী যুবলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য এডভোকেট সত্যেন্দ্র চন্দ্র ভক্তকে সাধারণ সম্পাদক করে মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির ৬১ সদস্যবিশিষ্ট নতুন দ্বিবার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। সম্মেলনে পদ্মরঞ্জন রাজবংশী, হরিপদ দত্ত ও বৃন্দাবন নাগকে সংখ্যালঘুদের আন্দোলন ও সেবায় অবদান রাখার জন্য পুরস্কৃত করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মেজর জেনারেল সিআর দত্ত (অবঃ) হিন্দু সম্প্রদায়ের ঐক্যকে আরও দৃঢ় করার এবং কেন্দ্র থেকে যখন যে নির্দেশ যায় সেভাবে কাজ করতে প্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল হয়নি, রমনা কালী মন্দিরও এখনো সরকার প্রতিষ্ঠা করে দেয়নি। অর্পিত সম্পত্তি আইন অবিলম্বে বাতিল করা না হলে শীঘ্রই অত্যন্ত কঠোর কর্মসূচী দেয়ার অঙ্গীকার করে তিনি বলে, এ কর্মসূচী বর্তমান সরকারের জন্য মোকাবিলা করা খুবই কষ্টকর হয়ে যাবে। সময় থাকতে যত দ্রুত সম্ভব অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিলের পরামর্শ দিয়ে বলেন, তা না হলে এ সরকারের সামনে ঘোরতর বিপদ অপেক্ষা করছে। তিনি সরকারের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে আরও বলেন, রমনা কালী মন্দিরের স্থানে স্বাধীনতা স্তম্ভ নির্মাণ করছেন, ভাল কথা। কিন্তু কালী মন্দিরের পুরো নির্মাণ করতেই হবে। ঐ জায়গায় হাত দেবেন না। এর পরিণাম শুভ হবে না। চিত্তরঞ্জন দত্ত তাদের বর্তমান আন্দোলন সারাদেশে ছড়িয়ে দেবার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়কে পরামর্শ দেন।

বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য বলেন, ৫ম ও ৮ম সংশোধনীর পর বর্তমান রাষ্ট্রীয় সংবিধান একটি সাম্প্রদায়িক দলিলে পরিণত হয়েছে এবং দেশে মারাত্মক সাম্প্রদায়িক পরিবেশের উদ্ভব ঘটেছে। কিন্তু পূজা উদযাপন পরিষদের সাম্প্রতিক আন্দোলনের ফলে ১৯৭২-এর ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান আমরা আবারও ফিরে পাব বলে আশা করছি। তিনি উল্লেখ করেন, এভাবে দেবী দূর্গার চেতনায় অশুর বধে আমাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে হবে।

অধ্যাপক ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক বলেন, এই পূজা উদযাপন কমিটি শুধু পূজা-অর্চনার জন্য প্রতিষ্ঠা হয়নি। এটি একটি আন্দোলনের জন্য আমাদের এই আন্দোলনের ফলে আগে সারাদেশে যেখানে ৫ হাজার পূজা হত, এখন সেখানে ১৫ হাজার পূজা হচ্ছে। পুরনো মন্দির সংস্কারের পাশাপাশি নতুন নতুন বহু মন্দির নির্মিত হচ্ছে। হিন্দুদের গুরুত্বপূর্ণ চাকরিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি হচ্ছে। অনেকে সচিবসহ বড় বড় পদে সমাসীন হতে পারছেন। এভাবে বাকী দাবী-দাওয়াও আন্দোলনের চাপে আদায় করা হবে। এ জন্য সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন, অর্পিত (শত্রু) সম্পত্তি আইন বাতিল হলে তা হবে আমাদের একটি বিরাট অর্জন। এরপর সংবিধানের ৫ম (বিসমিল্লাহ) ও ৮ম (রাষ্ট্রধর্ম) সংশোধনীও বাতিল করানো হবে এবং বাতিল একদিন হবেই। কারণ আন্তর্জাতিক সমর্থন আমাদের পেচনে রয়েছে। আমরা তাই বিনা চ্যালেঞ্জে কোন কিছু ছেড়ে দেব না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দাবী করে তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের ঐক্য, সংহতি টিকিয়ে রেখে তা আরও জোরদার করতে হলে সংবিধানের ৫ম ও ৮ম সংশোধনী বাতিলের কোন বিকল্প নেই। ডঃ নিমচন্দ্র ভৌমিক ১৯৪৭-এ দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে ভুল এবং বর্তমান সংবিধানের ৫ম ও ৮ম সংশোধনীকে সম্পূর্ণ অবৈধ আখ্যা দিয়ে বলেন, দেশ প্রতিষ্ঠার মূল নীতিমালা পরিবর্তনযোগ্য নয়। তিনি উল্লেখ করেন, শত্রু সম্পত্তি আইন বহাল থাকার কারণে আমাদের ৫০ লাখ হিন্দু বর্তমানে ভারতে চলে গেছে। কিন্তু ভারত তাদের কখনও নাগরিকত্ব ও সম্মান দেয়নি। এখন ওই আইনের কারণে যদি তারা এদেশের বাকি হিন্দুদের নিয়ে বাংলাদেশের কোন একটি অঞ্চলে পৃথক রাষ্ট্র দাবী করে বসে তবে তো এদেশ খন্ড-বিখন্ড হয়ে যাবে। তাদেরকে আমদের বলার কিছুই থাকবে না।

এডভোকেট সুব্রত চৌধুরী বলেন, বালাদেশে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য আমাদের সন্তানরাই সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করেছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সেই ত্যাগের মূল্যায়ন করেনি। তিনি বলেন, মাত্র ৫ লাখ উপজাতি চাকমার স্বার্থে আওয়ামী লীগ তাদের সাথে বহু ছাড় দিয়ে শান্তি চুক্তি করেছে, গঙ্গার পানি চুক্তি করেছে, ইনডেমনিটি বাতিল আইন পাস করেছে। কিন্তু ১ কোটিরও অধিক হিন্দুর স্বার্থে অর্পিত সম্পত্তি আইন বাতিল করেনি। তবে তাদের মনে রাখা উচিত তাদের যেমন এক ভোট, আমাদেরও তেমনি এক ভোট। সামনে 'গণেশ' উল্টে যাবে। তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, ৫ লাখ চাকমাকে ঠেকাতে পারেননি, আমাদের সাথে পারার তো প্রশ্নই আসে না। তিনি আওয়ামী লীগ নেতা মুকুল বোসকে 'দালাল' আখ্যায়িত করে বলেন, সরকার ঢাকেশ্বরী মন্দির উন্নয়নে ৩ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ করে ১ কোটি ২০ লাখ টাকা দিলেও তা থেকে মুকুল বোসরা ৭০ লাখ টাকাই কল্যাণ ট্রাস্টের নামে জোরপূর্বক নিয়ে গেছে। তিনি বলেন, কল্যাণ ট্রাষ্ট্রিরা সরকারের দালালি করছে। তারা আমাদের সামনে এগুতে দেয় না। কাজল দেবনাথ বলেন, পূজা উদযাপন পরিষদের দাবীতেই হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ হয়েছে হিন্দু সম্প্রদায়ের দাবী না মানলে আগামী দূর্গা পূজায় কঠিন কর্মসূচী দেয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

দৈনিক ইনকিলাব ১৫/৭/২০০০

বিঃ দ্রঃ হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সাধে আওয়ামী লীগ সরকারের সখ্যতার কথা সকলের জানা। আওয়ামী লীগ সরকারের প্রত্যক্ষ মদদে প্রশ্রায়েই যে অপতৎপরতা চালানো হচ্ছে তা বুঝতে পারো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

www.pathagar.com

বিবৃতি

ঢাকা, ১৬ই জুলাই, ২০০০ ইং

গত ১৪ই জুলাই পূজা কমিটির সম্মেলনে শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল ও 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাদ না দিলে হিন্দুরা পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানানোর যে হুমকি প্রদান করেছে তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম আজ (১৬/৭/০০) নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করেছেন ঃ

"গত ১৪ই জুলাই ঢাকেশ্বরী মন্দিরে অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগরী সার্বজনীন পূজা কমিটির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে হিন্দু সম্প্রদায়ের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অনতিবিলম্বে অর্পিত (শত্রু) ও অনাগরিক সম্পত্তি আইন বাতিল এবং সংবিধান থেকে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' ও 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম' তুলে দেয়া না হলে অখন্ড বাংলাদেশ ভেঙ্গে পৃথক হিন্দু রাষ্ট গঠনের যে হুমকি দিয়েছেন আমি তার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি। তাদের এ রাষ্ট্রোদ্রোহীতামূলক বক্তব্য এ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের প্রতি এক নগ্ন হুমকি ছাড়া আর কিছুই নয়। সরকারের কাছে বৈধ কোন দাবী জানানো এবং সেই দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করার অধিকার দেশের সকল নাগরিকেরই আছে। কিন্তু দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে হুমকি সৃষ্টি করার এখতিয়ার কারো নেই।

গোটা জাতি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সাথে লক্ষ্য করে আসছে যে হিন্দু, বৌদ্ধ, ক্রীস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ অতি সম্প্রতি মুসলমানদের নামের পূর্বে 'আলহাজ্ব' ও 'মুহাম্মদ' এবং এবং বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ও 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম' বাদ দেয়ার দাবী জানিয়ে বিষোদগার করে বক্তব্য প্রদান করেছেন। দেশের সর্বশ্রেণীর ধর্ম প্রাণ জনগণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরাম হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের এ অন্যায় বক্তব্যের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরবতা পালন করেছেন। সরকারের এ নিরবতার কারণে দেশবাসীর মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে সরকারের এ নিরবতার অর্থ কি হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের বক্তব্যের প্রতি মৌন সম্মতি নয়? এ বক্তব্যের সাথে সরকার ভিন্নমত পোষণ করলে সরকার এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করলো না কেন?

একই ভাবে গত ১৪ই জুলাই পূজা কমিটি শত্রু সম্পত্তি আইন বাতিল এবং 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ও 'রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম' বাতিল না করলে স্বাধীন অখন্ড বাংলাদেশ ভেঙ্গে স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র ঘোষণার দাবী জানানো সত্ত্বেও অদ্যাবধি সরকার কোন উচ্চ-বাচ্য করেনি। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করে রাষ্ট্রোদ্রোহীতামূলক বক্তব্য প্রদান করা সত্ত্বেও সরকার কি কারণে ঐসব রাষ্ট্রোদ্রোহী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না দেশবাসী তা জানতে চায়। দেশবাসীর মনে সরকারের আচরণ থেকে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে যে তাহলে কি সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহীদের মত হিন্দুদের জন্য আলাদা কোন রাষ্ট্র গঠনের ষড়যন্ত্র করছেন?

www.pathagar.com

হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ঐক্য পরিষদ নেতারা দাবী করছেন যে, '৪৭ সনে ভারত বিভাগ ভুল ছিল। ভারত বিভাগ যদি ভুল বলে স্বীকার করা হয় তাহলে স্বাধীন বাংলাদেশের কোন অস্তিত্ব কি আদৌ থাকে? তাহলে আওয়ামী লীগ সরকার কি হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃস্টান ঐক্য পরিষদের সাথে সুর মিলিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে ভারতের সাথে একীভূত করে অখন্ড ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখছেন? এ সম্পর্কে আমি আওয়ামী লীগ সরকারে কাচে সুস্পষ্ট বক্তব্য দাবী করছি।

দৈনিক সংগ্রাম ১৭/৭/২০০

বিরোধীদলের ওপর নির্যাতনের লক্ষ্যে সরকারের বানোয়াট তথ্য প্রচার

সোনার বাংলা রিপোর্ট ঃ বিরোধীদলের কয়েকজন নেতার একটি কথিত বৈঠকের খবর প্রচার করে সরকার একটি নতুন ষড়যন্ত্র এঁটেছে। সরকার যে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে কাজটি করেছে তা এখন পরিষ্কার।

চলতি মাসের প্রথম দিকে কয়েকটি পত্রিকায় 'নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা ফাঁস, বিরোধীদলের কয়েকজন নেতার গতিবিধির ওপর গোয়েন্দা সংস্থার সতর্ক নজর' শিরোনামে খবর ছাপা হয়। খবরটির সোর্স হিসেবে গোয়েন্দা সংস্থার নাম বলা হয়েছে। খবরটিতে বলা হয়েছে, গোয়েন্দা সূত্র জানায়, গত ২১ জুলাই বিএনপি নেতা খায়রুল কবীর খোকনের মালিবাগের বাসায় বিরোধীদলের কয়েকজন নেতা গোপন বৈঠক করেন। ওই বৈঠকে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য আত্মঘাতী কিছু কর্মকাণ্ডের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। খবরে আরো বলা হয়, বিমানবন্দর, রেলওয়ে স্টেশন, বা লঞ্চ টার্মিনাল, গ্যাস পাওয়ার স্টেশন, বিদেশী মিশন, সচিবালয় অথবা সরকারী কোনো বড় প্রতিষ্ঠানে আত্মঘাতী হামলা চালানোর সিদ্ধান্ত ওই বৈঠকে নেয়া হয়।

ওই বৈঠকে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান ও চট্টগ্রামের জামায়াত নেতা নূরুল হুদা, বিএনপি নেতা জাহাঙ্গীর আলম (চট্টগ্রাম) আফসার আহমেদ চৌধুরী (চট্টগ্রাম) উপস্থিত ছিলেন বলে পত্রিকাগুলো গোয়েন্দা বিভাগের সূত্রের বরাত দিয়ে জানায়।

এই সাজানো, ভিত্তিহীন প্রতিবেদনটি প্রকাশের পর বিএনপির মহাসচিব আবদুল মান্নান ভূঁইয়া, চারদলের লিয়াজোঁ কমিটি, জামায়াতের মুহাম্মদ কামারুজ্জামান ও অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, বিএনপির খায়রুল কবির খোকন প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। তারা এটাকে সরকারের একটি নীলনকশা হিসেবে চিহ্নিত করে বলেছেন, এদেশে সহিংস রাজনীতির ধারক ও বাহক একমাত্র আওয়ামী লীগ। বিরোধীদলের নেতাদের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালানোর লক্ষ্যেই সরকার এটি গোয়েন্দা বিভাগের নামে মিডিয়াতে প্রচার করেছে।

www.pathagar.com

গোয়েন্দা বিভাগের বরাত দিয়ে খবরটি ছাপা হলেও এটি যে আসলে সরকারেরই সাজানো তা রিপোর্টির বিভিন্ন দুর্বলতা থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রিপোর্টে বলা হয়েছে, খায়রুল কবির খোকনের বাসায় বৈঠক হয়েছে। খোকন বিএনপি'র নেতা। কিন্তু কোনো পলিসি মেকার নন। তার বাসায় এ ধরনের বৈঠকের খবর কোনোক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাছাড়া ওই রিপোর্টটিতে বিএনপি'র আরো যেসব নেতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের সাথে মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান ও অধ্যাপক মুজিবুর রহমানের মতো নেতারা বৈঠক করবেন এটা কারোর বিশ্বাস হওয়ার কথা নয় এবং বিশ্বাস করেওনি কেউ। অন্যদিকে চট্টগ্রামে জাহাঙ্গীর আলম ও আফসার আহমেদ চৌধুরী নামে বিএনপির পরিচিত নেতা বলে কেউ নেই। আর এতো 'গুরুত্বপূর্ণ' বৈঠক বিএনপি ও জাতীয় পার্টির পলিসি মেকারদের কেউ থাকবেন না– এটা কি আদৌ সম্ভব? এটা এই প্রতিবেদনের প্রধান দুর্বলতা।

সরকার ক্ষমতায় এসেই নানান ধরনের স্যাবোটাজের খবর প্রচার করেছে। বিদ্যুৎ টাওয়ার ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য সরকার বিরোধীদলকে দায়ী করেছিল। পরে এটি আদালতে গড়ায়। এই ধরনের কল্পিত স্যাবোটাজের খবর প্রচার করে সরকার আদালতে জরিমানার শিকার পর্যন্ত হয়েছিল। এর পরও সরকারের শিক্ষা হয়নি। প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার নানান ষড়যন্ত্রের গল্প দেশবাসী এ পর্যন্ত অনেকবার শুনেছে। আসলে সরকার 'স্যাবোটাজ' মেনিয়ায় ভুগছে।

কোথাও কোনো হত্যা, সহিংসতা অর্থাৎ ধ্বংসের ঘটনা ঘটলেই সরকার তার দায়-দায়িত্ব বিরোধীদলের ওপর চাপিয়ে দেয়। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মাদ নাসিম ও তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ সবচেয়ে বেশি সক্রিয়। চট্টগ্রামে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে এইট মার্ডার ও সাংবাদিক শামছুর রহমান হত্যার জন্য বিরেধীদলকে দায়ী করে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বক্তব্য দিয়েছেন। বিটিভিতে তথ্য প্রতিমন্ত্রী এই নিয়ে নানান অনুষ্ঠান করেছেন। কোটালীপাড়ায় কথিত বোমা পাওয়ার পর স্বারাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছিলেন এই ঘটনার পিছনে বিরোধীদলীয় নেত্রী খালেদা জিয়া জড়িত। কিন্তু বর্তমানে প্রমাণ হচ্ছে ওইসব বক্তব্য ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও সাজানো।

খুলনার আওয়ামী লীগ নেতা ও দলের মেয়র পদপ্রার্থী এসএমএ রব হত্যাকান্ডের পর সরকার বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে। রবের বড় ছেলে মিঠু বিবিসি'র সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'আওয়ামী লীগের একটি অংশ তার পিতাকে হত্যা করেছে।' মোহাম্মদ নাসিম নিহত রবের বাসায় গেলে মিঠু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছেন, "কোথাও কোনো হত্যাকাণ্ড ঘটলে আপনি সেখানে ছুটে যান এবং বলেন খুনী যেই হোক তার রক্ষা নেই। কিন্তু এ পর্যন্ত কোনো খুনেরই বিচার হয়নি, প্রকৃত খুনীরা ধরা পড়েনি। আমার বাবার হত্যার বিচার না হলে আমরা ৪ ভাই খুলনাবাসীদের সঙ্গে নিয়ে বাবার হত্যার বিচার করবো।"

দেশের বিভিন্ন সহিংস ঘটনা থেকে জনগণ এখন একথা ভাবতে বাধ্য হচ্ছে যে, সরকার নিজেই এসব ঘটনা ঘটিয়ে বিরোধীদলের ওপর নির্যাতন চালানোর পথ বের করছে। আলজেরিয়ায় বিরোধীদলকে শায়েস্তা করতে সেখানকার সরকার এ ধরনের কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে থাকে।

www.pathagar.com

জামায়াত নেতা মুহাম্মাদ কামারুজ্জামান ও অধ্যাপক মুজিবুর রহমান দু'জনেই রাজনৈতিক অঙ্গনে অত্যন্ত সুপরিচিত এবং তাদের ব্যাপারে জনগণের অজানাও কিছুই নেই। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে, কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলনে জামায়াত কখনই কোনো সহিংস পথ বেছে নেয়নি এটাও দেশবাসীর অজানা নয়। জামায়াত এবং এই সংগঠনের নেতারা সব সময় নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। তারা রাজনীতিকে গঠনমূলক বলেই মনে করে। কিন্তু সমস্যা হলো আওয়ামী লীগ সব সময়ই ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে বিশ্বাসী। এ কারণেই তারা ধ্বংসের নানান কল্প কাহিনী প্রচারেও দক্ষ।

সরকার প্রেরিত ঐ খবরে আরো বলা হয়েছে, সরকার বিরোধীদলের কয়েকজন নেতার গতিবিধির ওপর নজর রাখছেন এবং তাদের টেলিফোন 'সংলাপ রেকর্ড করা হচ্ছে। এরা হলেন– 'সাদেক হোসেন খোকা এমপি, দেলোয়ার হোসাইন সাঈদী এমপি, আমান উল্লাহ আমান এমপি, নাজিম উদ্দিন আলম এমপি, সালাহ উদ্দিন কাদের চৌধুরী এমপি এবং মশিউর রহমান এমপি। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে জামায়াতের আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, সহকার সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মদ কামারুজ্জামান, ঢাকা মহানগরী আমীর এ টি এম আজহারুল ইসলাম, জসিম উদ্দিন সরকার, বিএনপি নেতা মির্জা আব্বাস, গযেশ্বর রায়, শামসুজ্জামান, দুদু, মীর শওকত আলী, সালাহ উদ্দিন আহমেদ, এম এ খালেক খায়রুল কবীর খোকন, নাসির উদ্দিন পিন্টু, হাবিব-উন-নবী সোহেল, নজিবুল বশর মাইজভাণ্ডারী, সাইফুল আলম নীরব, গোলাম রসুল সাগর, চরমোনাই পীর, ইসলামী ঐক্য জোটের নেতা মাওলানা আজিজুল হক, ফ্রিডম পার্টির লেঃ কর্নেল (অবঃ) শাহজাহান, চৌধুরী মোহাম্মদ ফারুক, যুব কমাণ্ডের আবু নাসের মোহাম্মদ রহমত উল্লাহ এবং জাগপার শফিউল আলম প্রধান ও আনিসুর রহমান। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'গোয়েন্দা সংস্থা ইতোমধ্যে দু'জন সংসদ সদস্য এবং কয়েকজন রাজনীতিকের টেলিফোন সংলাপ থেকে নাশকতা ও সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে।

দেখা যাচ্ছে নামের তালিকায় কোনো সামঞ্জস্য নেই। ইচ্ছোমত নাম বসিয়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া তালিকায় এমন কিছু লোকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাদের রাজনৈতিক ভিত্তি নেই বললেই চলে। আসলে গোয়েন্দা বিভাগের নামে সরকারের দেয়া এসব নামের তালিকা থেকেই বুঝা যায় কাজটি সরকার অত্যন্ত কাঁচা হাতে করেছে এবং গোটা বিষয়টাই যে সাজানো, ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্রমূলক সেটাও প্রমাণ করছে।

সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ১৮/৮/২০০০

www.pathagar.com

শেষ কথা

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ, আপনারা লক্ষ্য করছেন যে বাংলাদেশের রাজনীতির আঙ্গিনায় একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। আওয়ামী লীগের পরিচালিত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বাংলাদেশকে এক গভীর অন্ধকার অরণ্যে নিক্ষেপ করছে। দেশে মানুষের জান-মাল ইজ্জতের কোন নিরাপত্তা নেই। সরকারী দলের লোকেরা হত্যাকাণ্ড, ধর্ষণ, ছিনতাইসহ সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িয়ে পড়েছে। সরকার প্রধান নিজে উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রদান করছেন। অস্ত্রও পেশী শক্তির জোরে প্রতিপক্ষকে দমন করার কৌশল গ্রহণ করে সরকার নিজেই আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটাচ্ছে। বিরোধীদল ও সাধারণ মানুষ অসহায়।

সরকার পরিকল্পিতভাবে প্রশাসন, পুলিশ, সংবাদপত্র, রেডিও টিভিতে বশংবদ বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার করে দেশে এক অনাকাঙ্খিত ফ্যাসিবাদী শাসন চাপিয়ে দিচ্ছে। রাজনৈতিক দলের উপর নিপীড়ন নির্যাতন চালানোর জন্য নানা অযুহাত সৃষ্টি ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে সরকার। এ প্রসঙ্গে দায়িত্বশীল বিরোধীদলসমূহ প্রতিবাদ জানিয়েছে। অযুহাত সৃষ্টি করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের উপর নিপীড়ন চালানোর পায়তারা করছে সরকার। বিরোধীদল বিশেষ করে বিএনপি ও জামায়াতের নেতাদের গোপন বৈঠকের কল্পিত কাহিনী প্রচার করে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে। ইতিপূর্বে সরকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য বিরোধীদলকে দায়ী করে যেসব খবর ছড়িয়েছিল তা অসত্য প্রমাণিত হয়েছে। সাম্প্রতিক কতিপয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোয়েবলসীয় অপপ্রচারনায় উস্তাদ আওয়ামী লীগ সরকার যে ধূম্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল তা বুমেরাং হয়েছে এবং সরকারের মুখোশ উন্মোচন হয়ে গিয়েছে। সরকার যেন অনেকটা বেসামাল। সবচেয়ে বড় কথা সরকারের সুবিধাবাদী নীতি ধয়া পড়ে গিয়েছে। নিজেদের স্বার্থে জামায়াতকে সাথে নিয়ে আন্দোলন করেছে আর এখন কিনা জামায়াতকে নিষিদ্ধ করার জিগির তুলেছে। আওয়ামী লীগের এসব বেঈমানী এবং সুবিধাবাদী কৌশল জনগণের নিকট এবং বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের নিকট সুস্পষ্ট হওয়ায় দরকার ছিল। তারা যে আদৌ গণতন্ত্রে বিশ্বাস করেনা তা বোধ হয় সাম্প্রতিক ভূমিকা থেকেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। সুতরাং এই অপশক্তি সম্পর্কে দেশবাসীর সজাগ হবার এটাই উপযুক্ত সময়।

www.pathagar.com